শ্রী শ্রী দামোদর ব্রত মাহাত্ম্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

॥ শ্রীশ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রী দামোদর ব্রত মাহাত্ম্য

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)- এর
প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের
অনুকম্পিত

শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের
শ্রীচরণাশ্রিত

শ্রীমান পতিত উদ্ধারণ গৌর দাস ব্রহ্মচারী
কর্তৃক সংকলিত

ভক্তিবেদান্ত গীতা একাডেমী
৭৯, স্বামীবাগ রোড, স্বামীবাগ আশ্রম, ঢাকা- ১১০০

প্রকাশক
শ্রীপাদ চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
মহাপরিচালক, ভক্তিবেদান্তগীতা একাডেমী

সংকলন সহযোগী
রসিক কানাই দাস
বি.বি.এ (অধ্যয়নরত), ঢা.বি.

কম্পোজ
সুধন্য গৌরাঙ্গ দাস

প্রুফ রিডার
সুভাষ রায়

প্রথম প্রকাশঃ
শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাস উৎসব ২০১২
৫,০০০ কপি

যোগাযোগ
শ্রী তরুণ শ্যাম দাস ব্রহ্মচারী
ভক্তিবেদান্ত গীতা একাডেমী
৭৯, স্বামীবাগ আশ্রম, ঢাকা-১১০০
মোবাইল - ০১৭৩০০৫৯২০৭
ই-মেইল - jps.tarunshyamdas@yahoo.com

বিষয়সূচী

ভূমিকা

লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতা যশোদার দামবন্ধন স্বীকার করে নিজে বিশুদ্ধ বাৎসল্যরস আস্বাদন করেছেন এবং নিজের অস্বাতন্ত্র্য তথা ভক্তাধীনতার পরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করেছেন। কার্তিক শুক্লা প্রতিপদেই তিনি সেই পরমোৎকৃষ্ট দামোদর লীলা প্রকটিত করেন। এজন্যই কার্তিক মাস 'দামোদর মাস' নামে প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন পুরাণাদিতে কার্তিক তথা দামোদর মাসের মহিমা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্র শ্রী হরিভক্তিবিলাসের ষোড়শ অধ্যায়ে দামোদর ব্রত বা নিয়ম সেবার বিধি সংকলিত হয়েছে। বিধি ও রাগমার্গী উভয় সাধকের জন্যই দামোদর মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পালনীয় ৬৪টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে উর্জাদরের (দামোদর ব্রত) উল্লেখ পাওয়া যায়। শাস্ত্রাদিতে এই মাসে প্রত্যহ শ্রীশ্রী রাধাদামোদর অর্চন ও সত্যব্রত মুনি কর্তৃক গ্রথিত 'শ্রীদামোদরাষ্টক' স্তোত্র পাঠের নির্দেশ দেওয়া আছে। এই স্তোত্র নিত্যসিদ্ধ এবং শ্রীদামোদর-কৃষ্ণকে আকর্ষণ করতে সমর্থ। শ্রীল প্রভুপাদও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে তা আলোচনা করেছেন।

এই মাসে ভগবান শ্রীদামোদরের সাথে শ্রীমতি রাধারাণীর আরাধনা করা উচিত। কেননা স্বীয় হ্লাদিনী শক্তি উর্জ্জেশ্বরী শ্রীমতি রাধিকা ব্যতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোনো সেবাই গ্রহণ করেন না। শ্রীদামোদরাষ্টকের শেষ শ্লোকেও তাই প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্রত সম্পর্কে বলছেন –

"চাতুর্মাস্য, দর্শ, পৌর্ণমাসী প্রভৃতি শারীরিক ব্রত পালন করিতে করিতে বৈরাগ্যের অভ্যাস হয়। আদৌ শয়ন-ভোজনাদি সম্বন্ধে সুখাভিলাষ ক্রমশঃ ত্যাগ করত শেষে সমস্ত সুখাভিলাষ ছাড়িয়া কেবল জীবনধারণমাত্র বিষয় স্বীকার করার অভ্যাস যখন পূর্ণ হয়, তখন বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়।"

চৈতন্যশিক্ষামৃত ২/২

তিনি আরেকটি প্রবন্ধে বলছেন–

"নিয়মসেবার বিধি এই- সেই মাসে প্রতিদিবসে রাত্রির শেষ যামে শুচি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মঙ্গলারতি করিবে। প্রাতে দামোদরার্চ্চন করিবে।

রাত্রে ঘৃত-দীপ বা তিল তৈলের দীপ ভগবন্মন্দিরে, তুলসীতলে এবং আকাশে প্রজ্জ্বলিত করিবে। কার্তিক মাসে নিরামিষ্য এবং ভগবানের প্রসাদান্ন ভোজন করিবে। পরান্ন, পরশয্যা, তৈল, মধু ও কাংস্যপাত্র ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে। প্রসাদসেবান্তে বৈষ্ণব সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রবণ বা পঠন করিবে। নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবে। এই প্রকার বিধি অবলম্বনপূর্বক উক্ত মাস যাপন করত উত্থান একাদশীতে নিরম্বু উপবাস ও কৃষ্ণকথায় রাত্রিজাগরণ করিবে। পরদিন প্রাতেঃ শুচি হইয়া হরিকীর্ত্তনান্তে বৈষ্ণবগণকে সেবা করাইয়া অবশেষে স্বয়ং প্রসাদ সেবন করিবে। সেই দিবস রাত্রিশেষে ব্রত সমাপ্ত করিবে। জিহ্বোপস্থের লাম্পট্য বৃদ্ধি কখনো শ্রী রাধাদামোদর সেবকের লক্ষণ নহে। যদি কাহারও এরূপ দুর্দৈব অসৎ সাহচর্য্য ফলে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, তবে তাহাদিগের নিয়মসেবা বাতুলতা মাত্র। কিছু বঞ্চনার আয়োজন ব্যতীত আর কিছু নয়।"

পরমার্থী তিন প্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত বৈধীভক্তির অঙ্গসমূহ যাজন করা স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্ত স্বীয় আচার্য নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করেন। নিরপেক্ষ ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তির দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন, শ্রীহরিনাম ও হরিকথা শ্রবণ কীর্তন দ্বারা পবিত্র ভাবে মাস যাপন করেন। যাঁরা জিতাত্মা এবং যাঁদের শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা স্বাভাবিক ভক্তি উদিত হয়েছে, উপবাসাদি তাঁদের চিত্তশুদ্ধির কারণ হতে পারে না। একান্ত কৃষ্ণভক্তদের নিকট শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই অত্যন্ত প্রিয়। এই দু'অঙ্গ পালনে তাঁরা এতই আগ্রহী যে অন্য কোনো অঙ্গ তাঁদের আকর্ষণ করতে পারে না।

তাই ভক্তগণ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও একান্তভাব ভেদে নিজ নিজ অধিকার চিন্তনপূর্বক শ্রীদামোদর মাস পালনে প্রবৃত্ত হবেন। ভগবান ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণই এই মাসের অধিপতি। তাই বৈষ্ণবেরা ভক্তিপূর্বক স্বীয় ভজনোন্নতির জন্যই নিজ নিজ আয়াস সাধ্যানুসারে এই ব্রত পালন করেন।

দামবন্ধন লীলা

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম ও দশম অধ্যায়ে লীলাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশ্যতা স্বীকার স্বরূপ দামবন্ধন লীলা বর্ণিত আছে। অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে বিধৃত লীলাদির প্রভূত রস আস্বাদন করেছেন বিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্যগণ। তন্মধ্যে শ্রীল শ্রীধর স্বামী 'ভাবার্থ দীপিকা', শ্রীল সনাতন গোস্বামী 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী', শ্রীল জীব গোস্বামী 'ক্রমদীপিকা' ও 'গোপালচম্পু', শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (রসিকাচার্য) 'সারার্থদর্শিনী টীকা', শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্যে সেসব লীলার চমৎকারিত্ব ও প্রাঞ্জলতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথা দামোদরের দামবন্ধন লীলা শ্রীল জয়পতাকা স্বামী, শ্রীল রাধাগোবিন্দ গোস্বামী ও শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজের মুখনিঃসৃত কৃষ্ণলীলা প্রবচন থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

লীলাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভৌমলীলায় অনেক আশ্চর্য ও চমকপ্রদ লীলা সম্পাদন করে গেছেন। তাঁর অনন্ত লীলার মধ্যে শৈশব লীলা অত্যন্ত মধুর। আর শৈশবকালে সম্পাদিত সকল লীলার মধ্যে দামবন্ধন লীলা ও যমলার্জুন উদ্ধার লীলা অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এই দু'টি লীলাতেই ভগবান তাঁর ভক্তবশ্যতা প্রদর্শন করেছেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মতে দামবন্ধন লীলাটি হয়েছিল দীপাবলি উৎসবের দিনে। তখন কৃষ্ণের বয়স ছিল ন্যূনাধিক তিন বছর চার মাস। শ্রীকৃষ্ণ তখন গোকুল মহাবনে ছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে ছিলেন তিন বছর চার মাস। তারপর নন্দবাবা বৃন্দাবনে যমুনার পশ্চিম তীরে ছটিকরাতে চলে যান। সেখানে আরো তিন বছর চার মাস থাকার পর কাম্যবন এবং পরিশেষে নন্দগ্রামে অবস্থান করেন।

একদিন মাতা যশোদা চিন্তা করছিলেন যে, কৃষ্ণ কেন অন্যান্য গোপীদের দধি, নবনীত ইত্যাদি চুরি করছে। নিশ্চয়ই তাঁর ঘরের তৈরি মাখন সুস্বাদু লাগছে না। এখানে যশোদা নামের অর্থটি খুবই প্রাসঙ্গিক। *যশোদা-* যিনি

যশ দান করেন। মা যশোদাই কৃষ্ণকে ভক্তবশ্যতার যশ প্রদান করেছেন। মহীয়সী যশোদা মাতাই ঠিক করলেন যে, তিনি আজ নিজেই দধি মন্থন করবেন। কৃষ্ণ তখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি। এদিকে রোহিনী দেবীও বলরামকে নিয়ে উপানন্দের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে গিয়েছেন। তাই তিনি গৃহপরিচারিকাদের অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত করে নিজেই দধি মন্থন করতে বসলেন। নন্দ বাবার নবলক্ষ গাভী ছিল। তার মধ্যে সাত-আটটি গাভী ছিল দুস্প্রাপ্য পদ্মগন্ধিনী গাভী। তাদেরকে বিশেষ প্রকারের ঔষধি ও সুগন্ধি তৃণগুল্মাদি খাওয়ানো হতো। যশোদা মাতা ভাবলেন, হয়তো দাসীরা ভালভাবে দধি মন্থন করছে না। এজন্য কৃষ্ণের মধ্যে ভয়ংকর চৌর্যবৃত্তি দেখা দিয়েছে। তিনি আপন মনে দধি মন্থন করছিলেন আর ইতিমধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন কৃষ্ণলীলা গান করছিলেন।

এখানে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, যাঁরা চব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত থাকতে চান, তাঁদের পক্ষে এই অভ্যাসটি আয়ত্ত করা কর্তব্য। কায়, মন ও বাক্য দ্বারাই সেবা করতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাই বলছেন- "কি শয়নে, কি ভোজনে কিবা জাগরণে। অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে।" আমরা সকল কাজ করার সময় মনে মনে - **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** ॥ জপ করতে পারি।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যশোদা মাতার রূপ ও গুণ বর্ণনা করছেন। মাতা যশোমতি তখন স্যাফরন হলুদ রঙের রেশমী কাপড় পরেছিলেন। এটি অতি পবিত্র কাপড়। দধিমন্থন কার্যে যেন কোনো অপবিত্র প্রভাব না পড়ে সেই জন্যই এই আয়োজন। খুব ভোরেই মা এই কাজটি শুরু করেছিলেন, যেন কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গের আগেই মাখন তোলা যায়। তবুও দধি মন্থনজনিত পরিশ্রমের কারণে তিনি ঘর্মাক্ত ছিলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল। মাথার ফুলের মালাটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে খসে পড়ছিল।

এই দৃশ্য সম্পর্কে আচার্যেরা বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। কঙ্কন ও কুণ্ডল নৃত্যচ্ছলে মাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। 'যে হাত ভগবানের সেবায় ব্যস্ত, আমরা সেই হাতে থেকে ধন্য'- এই কথা বোঝাতে হাতের কঙ্কনদ্বয় অস্ফূট ঝন্ ঝন্ শব্দ করছে। কানের কুণ্ডলগুলো নেচে নেচে এটিই সূচিত করছে যে, মায়ের মুখে ভগবানের লীলাগান শুনে কান তার উৎপত্তির সার্থকতা লাভ করেছে। আর মস্তকের কবরীস্থিত মালতি পুষ্প খসে পড়ার মাধ্যমে বোঝাচ্ছে যে, "হায়! হায়! বাৎসল্য প্রেমের মূর্তিমতী মাতা যশোদার মস্তকে থাকার ঔদ্ধত্য কি আমাদের সাজে, তাঁর চরণ পেলেই ধন্য হব আমরা।" চিন্ময় জগতে সবকিছুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাই সবকিছুর পৃথক পৃথক অভিব্যক্তি রয়েছে। এদিকে মাতার হৃদয়ের স্নেহই স্তনদুগ্ধরূপে বহির্গত হচ্ছে। কেননা একবার সুস্বাদু নবনীত দেখে, কৃষ্ণ যদি স্তন্যপান না করে। এই ভয়েতে কৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আপনাআপনি দুগ্ধ নিঃসরিত হচ্ছে। আবার, কঙ্কনের ঝন্ ঝন্ শব্দ আর দধি মন্থনের ঘর ঘর শব্দ করতাল ও মৃদঙ্গ বাদ্যরূপে মায়ের মুখের কৃষ্ণলীলা গানে সহায়তা করছে। একারণেই আমরাও ভগবানের বিভিন্ন সেবা করে আনন্দ লাভ করি। কেননা, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতির সেবা করলেই তো ইন্দ্রিয়ের প্রকৃত তৃপ্তি লাভ করা যায়।

এদিকে কৃষ্ণ ঘরের ভেতর ঘুমিয়েছিলেন। আর ঘুম থেকে ওঠামাত্রই ক্ষুধার্ত হয়ে মা'কে খোঁজ করছিলেন। তখন মায়ের সুললিত কণ্ঠে গান শ্রবণ করে ভাবলেন, "আজ কি হলো! মা আমাকে রেখেই বিছানা থেকেই উঠে পড়েছে। আমার জন্য কি তার কোনো দুশ্চিন্তা নেই?" তাই, তিনি দু'খানি পদ্মহস্ত দ্বারা নেত্রযুগল মার্জনা করতে করতে সেই দধি মন্থন স্থানে এলেন।

মা যশোমতির কি প্রগাঢ় সেবানিষ্ঠা। এদিকে কৃষ্ণ এসে দাঁড়িয়ে আছেন, তার কোন খেয়াল নেই। কৃষ্ণ ভাবলেন, আমার কিছু করা দরকার। তাই, সরাসরি মন্থন দণ্ডকে চেপে ধরলেন। কেননা, জ্ঞানীরা অগাধ শাস্ত্ররাজি মন্থন করে পরিশেষে কৃষ্ণকেই পায়। আর কৃষ্ণ এখানে সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান। তাই, মন্থনকার্য থামানোর মাধ্যমে যশোদা মায়ের সাধনার পূর্ণতার ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

মা অবশ্য চেষ্টা করছিলেন, "একটু সবুর কর বাছা; অল্প একটু মাখন তুলে নেই।" "না, আমি এখুনি দুধ খাব"। এই না বলে জোর করে

মায়ের কোমরে জাপটে ধরে, জানুর উপর পা দিয়ে কোলে উঠে পড়লেন। আর স্তন্য থেকে স্বতঃনিঃসরিত দুগ্ধধারা আস্বাদনে মনোযোগ দিলেন। মা তখন কৃষ্ণের নয়নাভিরাম সুমধুর মুখপানে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু সামনেই বৃহৎ চুল্লীর উপরে পদ্মগন্ধা গাভীর দুধ গরম করা হচ্ছিল। দুধ তখন ভাবল, "একি, পরস্পরের যেন প্রতিযোগিতা চলছে। হায়, স্নেহময়ী মা যশোদার দুগ্ধতো কখনো ফুরাবে না, আর প্রেমবুভুক্ষু শ্রীকৃষ্ণের তৃষ্ণাও তো মিটবে না। তবে, আমার কি হবে? যুগ যুগ ধরে সেই অধর স্পর্শ লাভের তপস্যা করছি, আর পেট ভরে গেলে তো কৃষ্ণ আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। এ জীবন কৃষ্ণের সেবায় লাগলো না। বেঁচে থেকে কি লাভ. বরং তাঁর সামনেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে বসি।" এই বলে অগ্নিতাপে স্ফীতা দুগ্ধ পাত্রের গা বেয়ে উপচে পড়তে লাগলো। মা হঠাৎ করে তা খেয়াল করলেন, আর সাথে সাথে দুধ নামানোর জন্য অতৃপ্ত কৃষ্ণকে কোল থেকে নামিয়ে মেঝেতে রেখে দৌঁড় দিলেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে মা যশোদার স্নেহ কি রকম? মনে হয়, কৃষ্ণের চেয়ে দুধের প্রতিই তাঁর মমতা। নতুবা তিনি কেন অতৃপ্ত অবস্থায় কৃষ্ণকে ফেলে চলে গেলেন? এর উত্তর হচ্ছে- হ্যাঁ, প্রেমী ভক্তের কাছে ভগবান 'পুরুষার্থ' নন, ভগবানের সেবাই 'পুরুষার্থ' শিরোমণি। একটু পরেই কৃষ্ণ এসে বলতে থাকবে, "দুধ দাও, নবনীত দাও"। তাই দুগ্ধ রক্ষার প্রতি এতো মনোযোগ।

এদিকে দুধ ভাবল, "একি! আমার মতো পাপিষ্ঠ আর কোথাও নেই। আমার জন্য আজ যশোদা মাতা ও কৃষ্ণের প্রেম আদান-প্রদান ব্যাহত হলো।" তাই সেও শান্ত হয়ে পড়ল।

এইভাবে তাঁকে ফেলে চলে যাবার ফলে মায়ের ওপর ভীষণ রাগ হলো। এখানে দেখার বিষয় এই যে, যদিও ভগবান 'আত্মারাম' ও 'আপ্তকাম', তবে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন কেন? মা যশোদার প্রীতিবন্ধনে তিনি যে কতটুকু আবিষ্ট সেটা একটু পরেই প্রমাণ করবেন সেজন্য। ক্রোধবশত, তাঁর

অরুণবর্ণ ঠোঁটে সাদা দুধের দাঁত দিয়ে তিনি কামড় দিচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন, "মা তুমি এতো কৃপণ, আজ দুধ-ই তোমার কাছে বড় হয়ে দাঁড়ালো। আমি কতো ক্ষুধার্ত, আমার জন্য কোনো চিন্তাই নেই। আমি বৈকুণ্ঠ ধাম ছেড়ে তোমাদের কাছে এসেছি। আর সামান্য দুধের জন্য এটি করতে পারলে! ঠিক আছে, মজা দেখাচ্ছি।" এই বলে কপট অশ্রু মোচন করতে করতে নিকটস্থ পেষণী (নোড়া- মশলা বাটাতে ব্যবহৃত) দিয়ে দধিভাণ্ডটি ভেঙ্গে ফেললেন। দধিভাণ্ডটিও আবার তলদেশ দিয়ে ভাঙ্গলেন যেন, বড় ধরনের শব্দ না হয়। আর সদ্যোজাত নবনীত খেতে খেতে পাশের ঘরে চলে যেতে লাগলেন। আর ভাবলেন, "যদি তোমার কোলে না রাখো, তবে আমি কোনো খল ব্যক্তির কাছে চলে যাব।" তাই সেখানে গিয়ে উল্টোভাবে রাখা উদুখলের উপর বসে বানরদেরকে শিখায় রাখা মাখন বিতরণ করছিলেন। আর চুরি করার ফলে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার ফলে, শঙ্কিত নেত্রে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। আচার্যেরাও ভাবছেন, হয়তো রাম অবতারের কথা স্মরণ হয়েছে, তখন কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই বানরদের কাজে লাগানো হয়েছে। তাই, এদেরকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কিছু দেওয়া উচিত। আবার, এটাও হতে পারে যে, ক্রোধবশতঃ দধিভাণ্ড ভাঙ্গার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তই এই দানব্রত।

মা যশোদা চুলা থেকে গরম দুধ নামিয়ে রেখে, দধি মন্থন স্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, দধিভাণ্ড ভগ্ন হয়েছে এবং সেখানে কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি কৃষ্ণেরই কার্য। আবার ঘরে স্থিত দধির মধ্যে ছোট ছোট পায়ের ছাপ দেখতে পেয়ে হাসলেন। একটি ছোট ছড়ি নিয়ে পেছন দিকে লুকিয়ে, আস্তে আস্তে কৃষ্ণের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, মা ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, তখন তিনি উদুখল থেকে লম্ফ প্রদান করে দ্রুত বেগে পলায়ন করেছিলেন, যেন তিনি অত্যন্ত ভীত হয়েছেন। আর যোগীরা মনের গতিতে যাঁর দিকে ধাবিত হয়েও তাঁকে প্রাপ্ত হয় না, তাঁকে ধরবার জন্য মা যশোদা ছড়ি হাতে পশ্চাদ্ধাবন করছেন। কৃষ্ণ জানতেন যে, আজ মা যদি ধরতে সক্ষম হয়, তবে আর রক্ষা নেই। কেননা আজ অনেকগুলো দুষ্কর্ম করা

হয়েছে। তাই, সর্বগ্রাসী কাল যাঁর ভয়ে ভীত, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ ভীত শঙ্কিত হয়ে পলায়ন করছেন।

মা যশোদার পক্ষেও দ্রুত দৌড়ানো সম্ভব ছিল না। তাঁর শরীর ও বেশভূষা দুই'ই তাঁর সঙ্গে বিরোধিতা করছিল- 'কেন তুমি আজ কানাইকে তাড়না করছ?' প্রথমে ঘরের ভেতরে দৌড়াদৌড়ি হচ্ছিল। পরে কৃষ্ণ গোকুলের রাস্তায় চলে এলেন। এদিকে ব্রজবাসীরা এই দৌড় প্রতিযোগিতা দেখছিলেন।

দুরন্ত কৃষ্ণ এদিক-সেদিক দৌড়াতে লাগলেন। কিন্তু নিতম্বভারে যশোদাদেবীর গতি মন্থর হলো। ঘর্মাক্ত কলেবর অবস্থায় মাথার কবরী খুলে গেল। কৃষ্ণও পেছন দিকে তাকিয়ে দেখতে চাইলেন মা কত দূরে। কিন্তু যশোদাদেবী খপ করে তাঁর ডান হাত ধরে ফেললেন।

বাঁ হাতে কৃষ্ণ তাঁর নয়নপদ্মযুগলের অশ্রুমোচন করছিলেন। এতে চোখের কাজল সারা মুখে ছড়িয়ে গেছে, আর বারবার ভীতশঙ্কিত নেত্রে মায়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। মা তখন লাঠি দ্বারা ভয় দেখাতে দেখাতে বলতে লাগলেন, "রে দুষ্ট, বানরবন্ধু, দধিভাণ্ড ভগ্নকারী! এখন নবনীতাদি কোথায় পাবে? আজ এমন ভাবে বেঁধে রাখব যেন বালকদের সাথে খেলতে না পার। এখন কেন ভয় পাচ্ছ?"

পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরূপে তিনি জানতেন যে, এতটুকু শিশুকে এতটা ভয় দেখানো ঠিক হবে না। অথচ তাঁকে একটু দণ্ড না দিলেই নয়। তাই, হাতের ছড়িটা ফেলে দিয়ে বেঁধে রাখতে মনস্থ করলেন। কেননা, ভয় পেয়ে আবার কোথায় পালিয়ে যায়, তার ঠিক নেই। তাই, যাঁর ভেতর-বাহির নেই, আদি-অন্ত নেই; যিনি জগতের পূর্বেও ছিলেন পরেও থাকবেন; যিনি জগতের ভেতরেও আছেন, বাইরেও আছেন আবার জগৎরূপেও বর্তমান; শুধু তাই নয়, যিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত, অব্যক্ত কিন্তু মনুষ্য আকৃতি গ্রহণ করায় মা তাঁকে স্বীয়পুত্র মনে করে উদুখলের সাথে বাঁধলেন। উদুখলের সাথে বাঁধার কারণ হচ্ছে, যে ব্যক্তি চুরিতে সহায়তা করে তিনিও চোর। তাই, দুই চোরকে একসাথে বেঁধে রাখলেন।

মা যশোদা যখন অপরাধী বালকটিকে বাঁধার চেষ্টা করছিলেন, তখন দু-আঙ্গুল দড়ি কম পড়ল। কেননা, ভগবানের কৃপাদৃষ্টি যাঁর ওপর পড়ে সে মুক্ত হয়ে যায়। মুক্ত জিনিসে আবার বন্ধন হবে কি করে? অথবা, গো-বন্ধনকারী (ইন্দ্রিয়সমূহ বন্ধনকারী) দড়ি আবার গো-পতি (ইন্দ্রিয়াধীশকে) বন্ধন করবে কি করে? তবে কেন মাত্র দু-আঙ্গুল কম পড়ল, এ বিষয়ে অনেক সিদ্ধান্ত রয়েছে-

- ভক্তের পূর্ণ প্রচেষ্টা, আর ভগবানের দয়ার ঘাটতি ছিল।
- সামনে আরো দু'টি বৃক্ষকে উদ্ধার করতে হবে, তারই সূচনা করা হচ্ছে প্রভৃতি।

তাই, তিনি তখন সেই দড়িটির সাথে আরেকটি দড়ি যুক্ত করলেন। কিন্তু সেটিও দু-আঙ্গুল কম পড়ল। এভাবে, যত দড়ি যোগ করা হয়, তা-ই দু'আঙ্গুল কম পড়ে। এভাবে নিজগৃহের সমস্ত দড়ি ফুরিয়ে গেলে, অন্যান্য ব্রজবাসীদের গৃহ থেকে দড়ি আনার পরেও একই অবস্থা। এতে গোপীরা হাসতে শুরু করল, আর যশোদাও হাসতে হাসতে বিস্ময়াপন্ন হলেন। কেননা, যাঁর কোমর মাত্র এক মুষ্টি, কিন্তু একশ হাত দড়িতেও তা বাঁধা পড়ছে না। তখন গোপীরা বলতে লাগল, "দেখ যশোদা, ওর কোমরে ছোট্ট সূতোয় বাঁধা কিঙ্কিনি কেমন রুনুঝুনু বাজছে। আর এত দড়িও দিয়ে তুমি তাঁকে বাঁধতে পারছ না। হয়তো, এর কপালে আজ বন্ধন নেই।" যশোদা বললেন, "আজ যদি সন্ধ্যা হয়ে যায়, গ্রামের সমস্ত দড়ি প্রয়োজনও হয়, তবুও এঁকে ছাড়ব না।" ভগবান যখন ভক্তের চেষ্টা দেখেন, তখন তিনি কৃপাপূর্বক বন্ধন স্বীকার করেন। তাই, যশোদার একান্ত জেদ দেখে, ভগবান তাঁর জেদ ছেড়ে দিলেন।

যিনি স্বীয় মায়ারজ্জুতে নিখিল জগৎ বন্ধন করে রেখেছেন, তিনি আজ মায়ের রজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি মহান দেবতারা সহ এই নিখিল বিশ্ব যাঁর বশীভূত, সেই স্বতন্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এভাবে তাঁর ভক্তবশ্যতা দেখিয়েছেন। মা যশোদা মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের কাছে যে অনুগ্রহ লাভ করেছেন, তা ব্রহ্মা, মহেশ্বর এমনকি ভগবানের অর্ধাঙ্গ বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও প্রাপ্ত হননি। যশোদানন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তদের পক্ষে যে রকম সুলভ, মনোধর্মী

জ্ঞানী, আত্মোপলব্ধিকামী তাপস বা দেহাত্মবুদ্ধি পরায়ণ ব্যক্তির কাছে তেমন সুলভ নন।

মা যশোদা তাঁর ছেলেকে এভাবে বেঁধে রেখে গৃহকর্মে ব্যস্ত হলেন। তখন উদুখলে বাঁধা শ্রীকৃষ্ণ বাড়ির সামনে দু'টি অর্জুন গাছ দেখতে পেলেন। এ দু'টি গাছের একটি ইতিহাস আছে। এরা ধনপতি কুবেরের পুত্র নলকুবের ও মনিগ্রীব। সাক্ষাৎ শিবের অনুচর হওয়া সত্ত্বেও এদের মাথায় কুবুদ্ধি প্রবেশ করে। তারা বারুণী সুধাপানে উন্মত্ত হয়ে দিগম্বর অবস্থায় জলে নেমে, প্রমত্ত হাতির মতো দেবাঙ্গনাদের সাথে জলক্রীড়া করতে লাগল। তখন নারদ মুনি সেদিকে আসছিলেন। তা দেখে দেবাঙ্গনারা তাদের স্বীয় বস্ত্র পরিধান করল। কিন্তু সেই পাষণ্ডদ্বয় নারদ মুনিকে উপেক্ষা করল। কিন্তু নারদ মুনি তাঁদের দুরাবস্থা দেখে করুণার্দ্র হলেন এবং বৃক্ষ যোনি প্রাপ্ত হয়ে চিরকাল নগ্ন থাকার অভিশাপ দিয়েছিলেন। তারাই সেই অর্জুন বৃক্ষদ্বয়। কৃষ্ণ ভাবলেন, "যদিও এরা কুবেরের পুত্র, এতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু যেহেতু নারদ মুনি এদেরকে উদ্ধার করতে মনস্থ করেছেন। তাই এদের উদ্ধার করতে হবে।"

তাই শ্রীকৃষ্ণ তখন গাছ দু'টির মাঝখান দিয়ে যাওয়া শুরু করলেন। এতে পেছনে বাঁধা উদুখলটি বক্রভাবে গাছটিতে আটকে পড়ে। তিনি তখন প্রবল বিক্রমের প্রকাশরূপ অবলীলায় গাছ দু'টি ভেঙ্গে ফেললেন। সাথে সাথে বৃক্ষ দুটির মধ্যে থেকে অগ্নির মতো দুই মহাপুরুষ নির্গত হলেন। তাঁদের সৌন্দর্যের ছটায় সর্বদিক আলোকিত হয়েছিল এবং তাঁরা অবনত মস্তকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি জানিয়ে স্তুতি করতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন, "দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত কৃপাময়। ধনমদে অন্ধ, তোমাদের দু'জনকে অভিশাপ দিয়ে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর মহৎ কৃপা প্রদর্শন করেছেন। যদিও তোমরা স্বর্গ থেকে অধঃপতিত হয়ে বৃক্ষ যোনি প্রাপ্ত হয়েছিলে, তবুও তোমরা নারদমুনির অনুগৃহীত। সূর্যের আগমনে যেভাবে চক্ষুর অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনি ঐকান্তিকভাবে আমার শরণাগত এবং আমার সেবায় কৃত সঙ্কল্প ভক্তের সাক্ষাৎকারের ফলে, কারও আর জড় বন্ধন থাকতে পারে না। তোমরা দু'জনে এখন

গৃহে ফিরে যেতে পার। তোমরা যেহেতু সর্বদা আমার ভক্তিতে মগ্ন হতে চেয়েছিলে, তাই তোমাদের বাসনা পূর্ণ হলো, আর সেই স্তর থেকে তোমাদের কখনও অধঃপতন হবে না।"

তখন তাঁরা কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে চলে গেল। কিন্তু নিকটে ক্রীড়ারত বালকেরা সব দেখছিল। এদিকে প্রচ- বজ্রপাতের শব্দে গাছ পড়ে যাওয়াতে নন্দ মহারাজ আদি গোপেরা নতুন বিপদের আশংকা করে সেখানে এলেন। কিন্তু দুটি গাছকে পতিত দেখতে পেয়েও, তার কারণ নির্ণয় করতে অসমর্থ হলেন। কৃষ্ণতো সেখানে উদুখলে বদ্ধ হয়ে আছে। তবে কে এই কাজটি করল?

তখন সেই ছোট বালকেরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবকিছু খুলে বলল। গভীর বাৎসল্য প্রেমের ফলে নন্দ মহারাজ প্রমুখ গোপেরা বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, শ্রীকৃষ্ণ এত আশ্চর্যজনকভাবে বৃক্ষ দু'টি উৎপাটন করেছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ ভাবতে লাগলেন, "যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের সমতুল্য হবে, তাই সে এই কার্য করেও থাকতে পারে।"

নন্দ মহারাজ তাঁর পুত্রকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় উদুখল নিয়ে টানাটানি করতে দেখে হাসতে হাসতে তাঁকে বন্ধনমুক্ত করেছিলেন। এই দুটি লীলার মাঝেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর 'ভক্তবশ্যতা' গুণ প্রদর্শন করলেন।

কৃষ্ণকে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে বলরাম অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন। তিনি হুঙ্কার করতে লাগলেন, "কে বেঁধেছে? কার এত বড় সাহস?" তখন সামনে বালকদের মধ্যে কেউ মাতা যশোদার নাম বলে দিল। তখন যশোদা মাতাও এদিকে এল। বলরামকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে? চেঁচামেচি করছ কেন?" বলরাম বললেন, "তুমি জানো কৃষ্ণ কে? এই কৃষ্ণই নারায়ণ, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, এই কৃষ্ণই বামন, কৃষ্ণই মৎস্য, কৃষ্ণই কূর্ম, এই কৃষ্ণই নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ করেছিল. . .।" যশোদা বলল, "আর তুমি কে?" বলরাম জানাল, "আমি সঙ্কর্ষণ, আমি শেষ নাগ, আমার মাথায় এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সর্ষপাকৃতির ন্যায় বিরাজ করে। আমি মুহূর্তেই এই বিশ্ব ধ্বংস

করে দিতে পারি।" যশোদা বলল, "আরে আরে. . . । সব অবতারই আমার ঘরে ঢুকে বসে আছে। কেন? আর কোনো ব্রজবাসীর ঘরে কি জায়গা ছিল না? আমার ছড়িটা কোথায়? এখুনি নৃসিংহ আর সঙ্কর্ষণের ভূত পিটিয়ে ছাড়াব।" বলরাম তখন ভয় পেয়ে দৌড়ে পালালেন। বাৎসল্য প্রেমের কাছে ভগবানের ঐশ্বর্য আজ পরাভূত।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে অনেকগুলো আশ্চর্যমণ্ডিত ও অপ্রকাশিত গুণাবলী প্রদর্শন করেছেন-

- ❑ *স্তন্যকাম*- যিনি আত্মারাম, যাঁর কিছুই দরকার নেই, তিনি মাতৃদুগ্ধের জন্য লালায়িত হলেন।
- ❑ *আপ্তকাম*- যিনি সর্বদাই সন্তুষ্ট, তিনি পর্যাপ্ত দুগ্ধ পান করেও অতৃপ্ত।
- ❑ *ক্রোধান্বিত*- যিনি সবচেয়ে শুদ্ধ, ত্রিগুণাতীত, তিনি রজোগুণাত্মক ক্রোধান্বিত হলেন।
- ❑ যাঁর ভয়ে ভয়ঙ্কর কাল, যমরাজ, এমনকি মূর্তিমান ভয়ও ভীত হয়, তিনি মাতার শাসনের জন্য ভয় পাচ্ছেন।
- ❑ মনের গতিতে ধাবমান হয়েও যোগীরা যাঁকে ধরতে পারেন না, মাতা যশোদা একটু দৌড় দিয়েই তাঁকে ধরে ফেললেন।
- ❑ যিনি কর্মবন্ধন দ্বারা ইন্দ্র থেকে শুরু করে সমস্ত দেবতা ও জীবদের কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে রাখেন, যাঁর আদি-মধ্য-অন্ত্য নেই, তিনি মাতা যশোদার রজ্জুতে আবদ্ধ ইত্যাদি।

শ্রীমৎ সত্যব্রত মুনি কর্তৃক রচিত ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদকৃত দিগদর্শিনী টীকা সম্বলিত

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যং ততো দ্রুত্য গোপ্যা ॥১॥

অনুবাদঃ যিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, যাঁর কর্ণযুগলে কুণ্ডল আন্দোলিত হচ্ছে, যিনি গোকুলে পরম শোভা বিকাশ করছেন এবং যিনি শিক্য অর্থাৎ শিকায় রাখা নবনীত (মাখন) অপহরণ করায় মা যশোদার ভয়ে উদূখলের উপর থেকে লম্ফ প্রদান করে অতিশয় বেগে ধাবমান হয়েছিলেন ও মা যশোদাও যাঁর পশ্চাতে ধাবিত হয়ে পৃষ্ঠদেশ ধরে ফেলেছিলেন, সেই পরমেশ্বররূপী শ্রীদামোদরকে প্রণাম করি।

দিগদর্শিনী টীকাঃ শ্রীমতি রাধারাণীর সাথে বর্তমান শ্রীদামোদর ঈশ্বরকে প্রণাম করে এই দামোদরাষ্টকের (দিকদর্শিনী) ব্যাখ্যা আরম্ভ করছি। সত্যব্রত মুনি কিছু প্রার্থনা করার আগেই তত্ত্ব-রূপ-গুণ-লীলাদির বৈশিষ্ট্যদ্বারা উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত ও গোকুলে প্রকটিত ভগবত্তার সারসর্বস্ব বিশেষণগুলো বর্ণনা করার প্রথমেই নমস্কার করছেন 'নমামীতি'।

নমামি শব্দে নমস্কার মঙ্গলার্থ। সকল অনুষ্ঠানের শুরুতেই ইষ্টদেবতার নমস্কার করতে হয়। এটা ভগবানের দাস্য সূচক। প্রথমেই টীকাকার শ্রীল সনাতন গোস্বামী তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করছেন। কাকে নমস্কার? ঈশ্বরকে, যিনি সর্বশক্তিমান, জগতের একমাত্র নাথ অথবা আমার প্রভু; তাকে নমস্কার। প্রথম পক্ষে, সর্বশক্তিমান বলছেন যেন তিনি স্তুতি করার শক্তি অর্জন করতে পারেন। দ্বিতীয় পক্ষে, 'জগতের একমাত্র নাথ' অর্থাৎ পরম বন্দনীয়। সবশেষে 'আমার প্রভু' বলার কারণ- ভক্তিবিশেষ জ্ঞাপন। তিনি কেমন? সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সৎ, চিদ্ ও আনন্দঘন বিগ্রহ। এর মাধ্যমে তাঁর তত্ত্ব বিশেষের শ্রেষ্ঠতা দেখানো হলো।

(এখন রূপ সম্পর্কে) সৌন্দর্য বিশেষের শ্রেষ্ঠতা- মাতা যশোদার ভয়ে ধাবিত হওয়াতে বা সবসময় বাল্যক্রীড়াবশত যাঁর গণ্ডযুগলে বা গালদ্বয়ে মকর-কুণ্ডল ক্রীড়াশীল। এর মাধ্যমে শ্রীমুখের সৌন্দর্য বর্ণিত হলো। 'লসৎ কুণ্ডলং' এর অন্য অর্থ-মকর-কুণ্ডল মহা সৌভাগ্যবান, কেননা তা ভগবানের শ্রীগণ্ডযুগলের (গালদ্বয়) চুম্বন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। এর তাৎপর্য এই যে, যাঁর অঙ্গশোভা হতে কুণ্ডলদ্বয় শোভাযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হলো ভূষণেরও ভূষণ।

এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে গোপীরা বলছেন- "হে কৃষ্ণ! তোমার ত্রিজগতের মনোহরকারী এই রূপ দর্শন করলে গাভী, পশু, পাখি, এমনকি বৃক্ষগণ পর্যন্ত পুলকিত হয়।" (আমরা যে মোহিত হব, এতে আশ্চর্যের কি আছে?) শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রী উদ্ধবও বিদুরের নিকট তৃতীয় স্কন্ধে বলেছেন- "শ্রীকৃষ্ণের রূপ এতই মনোহর যে, এতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময় হয়। এটা সমস্ত সৌভাগ্যের সৌভাগ্য, সকল ভূষণেরও ভূষণ।"(অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের পরম অলৌকিক)

এখন পরিকর বিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব- 'গোকুলে' অর্থাৎ গোপ-গোপী, গোবৎসাদির, যিনি 'ভ্রাজনম্'- সবচেয়ে যোগ্যস্থান (পূর্ব পূর্বলীলার চেয়েও অথবা গোকুলের স্বাভাবিক শোভায় শোভমান। এটা দশম স্কন্ধেও বর্ণিত হয়েছে (১০/৩২/১৪) - "সিদ্ধ যোগীরা তাঁদের হৃদয়-পদ্মের মধ্যে যাঁর আসন চিন্তা করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকের ত্রিকালের সমগ্র শোভা একসাথে নিজদেহে আবির্ভূত করে গোপীদের প্রদত্ত আসনে বসে, গোপীমণ্ডল মধ্যে গোপীগণ কর্তৃক পূজিত ও অনির্বচনীয় সুষমায় শোভিত হচ্ছিলেন।"

এখন লীলা বিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব- যে যশোদা মায়ের কাছ থেকে, দধিভাণ্ড ভগ্ন করা ও মাখন চুরি করা প্রভৃতি অপরাধের ভয়ে 'উদুখলাৎ'- শিকায় রাখা মাখন চুরি করার জন্য উল্টানো উদূখলের নিম্নদেশে বসেছিলেন এবং (এমন সময় লাঠি হাতে মাকে আসতে দেখে) সেখান থেকে, 'ধাবমানং'- (যিনি) অতিদ্রুত পালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ বিষয়ে যিনি আরো জানতে চান, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের দশম শ্লোক দেখতে পারেন।

"শ্রীকৃষ্ণ তখন উল্টোভাবে রাখা একটি উদূখলের উপর বসে তাঁর ইচ্ছামতো দধি, ননী আদি দুগ্ধজাত দ্রব্য বানরদের মধ্যে বিতরণ করছিলেন। মা যশোদা তখন তাঁকে এই অবস্থায় দেখে ধীরে ধীরে তাঁর পেছনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর মাকে ছড়ি হাতে দেখলেন, তখন তিনি দ্রুতবেগে উদূখলের উপর থেকে লাফ দিয়ে ভয়ার্ত ব্যক্তির মতো পলায়ন করলেন। যোগীরা কঠোর তপস্যা বলে ব্রহ্মে লীন হওয়ার চেষ্টা করেও যাকে প্রাপ্ত হন না, মা যশোদা সেই কৃষ্ণকে পুত্র মনে করে ধরার জন্য ধাবিত হলেন।"

পুত্র শ্রীকৃষ্ণ এমন কুকর্ম করে পালিয়ে যাচ্ছে দেখে মাতা যশোমতীও আরো দ্রুত বেগে কৃষ্ণের পেছনে ধাবিত হয়ে, তাঁর পৃষ্ঠদেশ ধরে ফেললেন। 'শ্রীকৃষ্ণ হতেও দ্রুত বেগে' বলতে মাতা যশোমতীরও স্থূল স্তন-নিতম্বাদি সৌন্দর্য বিশেষ ও পুত্রস্নেহ বিশেষই সূচিত হচ্ছে। 'গোপ্যা' এই প্রেমোক্তির মাধ্যমে - গোপজাতিরই এমন সৌভাগ্য হয়েছিল জানতে হবে। 'পরামৃষ্টং' অর্থাৎ কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশে ধৃত হয়েছিলেন- এর দ্বারা সেই যশোদা মাতার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ বিশেষ (ভক্তবাৎসল্য) প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১০/৯/১০) দেখা যায়- শ্রীকৃষ্ণের অনুধাবনকারিনী ক্ষীণ কটি সম্পন্না যশোদাদেবীর গতি তাঁর নিতম্বভারে মন্থর হয়েছিল। দ্রুতবেগে দৌড়ানোর জন্য চুলের খোঁপা থেকে পুষ্পসকল পড়তে পড়তে তাঁর অনুগমন করতে লাগল। এভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে তিনি কৃষ্ণকে ধরে ফেললেন।"

ইতি – শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের প্রথম শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকৃত দিগ্‌দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ।

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্ ।
মুহুশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ॥২॥

অনুবাদঃ যিনি জননীর হস্তে যষ্টি দেখে রোদন করতে করতে দু'খানি পদ্মহস্ত দ্বারা বারবার নেত্রদ্বয় মার্জন করেছেন, যিনি ভীতনয়ন হয়েছেন ও সেইজন্য মুহুর্মুহুঃ শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত কম্প-নিবন্ধন যাঁর কণ্ঠস্থ মুক্তাহার দোদুল্যমান হচ্ছে এবং যাঁর উদরে রজ্জুর বন্ধন রয়েছে, সেই ভক্তিবদ্ধ শ্রীদামোদরকে বন্দনা করি ।

দিগদর্শিনী টীকা: এখন লীলা বর্ণনামুখে ভাগবতের (১০.৯.১১) শ্লোকের তাৎপর্য গ্রহণ করছেন- "মা যশোদা তাঁকে ধরে ফেললে, কৃষ্ণ অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁর অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। মা যশোদা দেখলেন যে, কৃষ্ণ ক্রন্দন করতে করতে তাঁর করপদ্ম দিয়ে নয়নযুগল ঘর্ষণ করার ফলে, তাঁর সারা মুখে কাজল লেগে গেছে। মা যশোদা তখন তাঁর সুন্দর পুত্রটিকে হাত দিয়ে ধরে মৃদু ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।"

ভাগবতের এই লীলা গ্রহণ করেই (দ্বিতীয় শ্লোকটি) বলছেন- "রুদন্তমিতি'- মায়ের হাতে লাঠি দেখেই, এটা দ্বারা মা পেটাবেন- এই ভয়ে, 'পেটানোর ভয়েই নিজে ভীত হয়েছেন' এটা দেখে মাতা আর লাঠি দ্বারা পেটাবেন না- এই ভেবে, অর্থাৎ মায়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি কাঁদছিলেন এবং পদ্মের ন্যায় মনোহর ছোট দুটি হাত দিয়ে নয়নপদ্ম বারবার ঘষছিলেন। এটা ভগবানের স্বভাবসিদ্ধ বাল্যলীলা ।

'করাম্ভোজ যুগ্মেন নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং'- এর আরেক রকম অর্থ করা যেতে পারে- ভয়ের আবেশে সহজেই চোখে জল চলে আসে; সেই অশ্রু মোছার জন্য যিনি বারবার চোখ দুটি মার্জন করছিলেন। 'সাতঙ্ক নেত্রম্'- (মায়ের লাঠির ভয়ে) যাঁর নয়নযুগল শঙ্কাকুল (ভীত), এমনকি তাঁর মনও ভীত ছিল। এই বাক্যের অন্য অর্থ- ভীতিযুক্ত দৃষ্টি সমন্বিত চোখ। মার খাওয়া থেকে বাঁচার জন্য এই গোপন লীলা ।

আবার, তিনি কেমন? 'মুহুঃশ্বাসেন'- বারবার কান্না করতে করতে কম্পমান, 'ত্রিরেখাঙ্ক'- শঙ্খের মতো তিনটি রেখা যুক্ত, গলায় সমস্ত মুক্তাদি নির্মিত হার এবং যাঁর উদরে দাম অর্থাৎ দড়ি (সেই দামোদরকে)। এভাবে, যশোদা প্রাকৃতমাতা যেভাবে চঞ্চলমতি দুষ্ট ছেলেকে বেঁধে রাখেন সেভাবে শ্রীকৃষ্ণকেও নিজ পুত্রের মতো স্বাভাবিকভাবে উদুখলের সাথে বেঁধেছিলেন। (ভাঃ ১০-৯-১৪)

দড়ি বা রজ্জুর একদিক উদরে অপরদিক উদুখলের সাথে বেঁধেছিলেন; কেননা এত ভারি উদুখল নিয়ে গোপাল পালাতে পারবে না- এভাবে ভগবান তাঁর ভক্তবশ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাচ্ছেন। 'ভক্তের'- যিনি ভক্তির দ্বারাই অর্থাৎ মায়ের পক্ষে পুত্রকে বাৎসল্যময়ী ভক্তির দ্বারা এবং কৃষ্ণের পক্ষে ভক্তবশ্যতারূপ- মাতৃভক্তির দ্বারাই, 'বদ্ধং'- বাঁধা পড়েছিলেন; কিন্তু দড়ির শক্তিতে তিনি বাঁধা পড়েন নি। যেহেতু যশোদা মাতার গৃহের সকল দড়ি একসাথে করেও বাঁধতে পারেন নি, সবসময়েই 'ন্যূনং'- দুই অঙ্গুলি ছোট। তাই ভাগবতের (১০.৯.১৫-১৭) শ্লোকে বলা হচ্ছে- "মা যশোদা যখন অপরাধী বালকটিকে বাঁধার চেষ্টা করছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, দড়িটি দুই আঙ্গুল ছোট। তাই, তিনি সেটির সাথে আরেকটি দড়ি যুক্ত করলেন। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও তা দুই আঙ্গুল ছোট হয়েছিল। এভাবে মা যশোদা যত দড়ি নিয়েছিলেন, সবই দু'আঙ্গুল ছোট হয়েছিল। এভাবে সব দড়ি একত্রে করেও কৃষ্ণকে বাঁধতে পারলেন না দেখে, প্রতিবেশী গোপীরা ও মা যশোদা হাসতে হাসতে বিস্ময়াপন্ন হয়েছিলেন।"

অথবা- এই দামোদর লীলার কারণ তিনি একমাত্র ভক্তিদ্বারাই 'বদ্ধং'- বশীকৃত তা বোঝানো। এ সম্পর্কে ভাগবতের (১০.৯.১৮-২১) শ্লোকে বলা হচ্ছে- "মা যশোদা পরিশ্রান্ত হয়ে ঘামছিলেন এবং তাঁর খোঁপার মালা পড়ে গিয়েছিল। বালকৃষ্ণ তাঁর মাকে এভাবে পরিশ্রান্তা দেখে, তাঁর প্রতি অনুকম্পাবশত বাঁধা পড়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণসহ এই বিশ্ব চরাচর যাঁর বশীভূত, সেই স্বতন্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এভাবেই তাঁর ভক্তবশ্যতা দেখিয়েছিলেন। মা যশোদা জগতের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হতে যেমন কৃপাপ্রাপ্ত

হয়েছিলেন, তা ব্রহ্মা, মহেশ্বর এমনকি অর্ধাঙ্গ বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও তা পাননি। গোপীকাসূত যশোদানন্দন ভক্তদের কাছে যেমন সুলভ; দেহাভিমানী তাপস, মনোধর্মী জ্ঞানী অথবা দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে তেমন সুলভ নন।

ভাগবতের (১০.১০.২৫) শ্লোকেও বলা হচ্ছে- "যেহেতু আমার প্রিয়তম ভক্ত নারদমুনি চেয়েছে যে, আমি তাদের উদ্ধার করি এবং তারা কুবেরের পুত্র, তাই আমি তা করব।" এখানেও শ্রীকৃষ্ণ নারদমুনির ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে 'যমলার্জুন ভঞ্জন' লীলা করেছেন। এই অর্থও 'ভক্তিবদ্ধ'- এই বিশেষণ দ্বারা সূচিত হয়েছে।

ইতি-শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকৃত দিগ্‌দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ।

ইতীদৃকস্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥৩॥

অনুবাদঃ যিনি এইরকম বাল্যলীলার দ্বারা সমস্ত গোকুলবাসীকে আনন্দ সরোবরে নিমজ্জিত করেন এবং যিনি ভগবদৈশ্বর্য-জ্ঞান-পরায়ণ ভক্তসমূহে 'আমি কর্তৃক পরাজিত অর্থাৎ ভক্তের বশীভূত'- এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সেই ঈশ্বররূপী দামোদরকে আমি প্রেম-সহকারে শত শতবার বন্দনা করি।

দিগদর্শিনী টীকা: গুণবিশেষের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হচ্ছে- 'ইতি' অর্থাৎ এই রকম ভক্তবশ্যতা দ্বারা। অথবা 'ইতি'- এই দামোদর লীলার দ্বারা এবং এই দামোদর লীলার মতো অন্যান্য বাল্যলীলার দ্বারা, 'স্ববস্য'- নিজের অসাধারণ, 'লীলাভিঃ'- লীলার মাধ্যমে গোকুলবাসী সমস্তজীবদের আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন করেন। ভাগবতের (১০.১১.৭-৮) শ্লোকে বলা হচ্ছে, গোপীরা বলতেন, "কৃষ্ণ, তুমি যদি নাচ, তাহলে আমরা তোমাকে এই লাড্ডু দেব।" এরকম বাক্যের দ্বারা অথবা করতালির দ্বারা তারা নানাভাবে কৃষ্ণকে উৎসাহিত করতেন। অখিল

ঐশ্বর্যসম্পন্ন ও সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের হাতের পুতুলের মতো বশীভূত ছিলেন। তাদের কথামতো গাইতেন ও নৃত্য করতেন। কখনো মা যশোদা ও অন্যান্য গোপীরা কৃষ্ণকে কাঠের পিড়ি, পাদুকা বা ধান মাপার কাঠের পাত্র প্রভৃতি আনতে বলতেন। তিনি এসকল দ্রব্য আনতে অক্ষম, এরকম ভাব করে সেগুলো ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং কখনো আত্মীয়-স্বজনদের আনন্দদানের জন্য হাত তুলে নিজের শক্তি প্রদর্শন করতেন।

ভাগবতের এই বাক্যগুলো অবলম্বন করেই বলেছেন যে- 'স্ব-ঘোষঃ'- নিজ গোকুলবাসী প্রাণীদেরকেই, 'আনন্দকুণ্ড'- আনন্দ রসময় গভীর জলাশয়, 'নিমজ্জন্তং'- অত্যন্ত নিমগ্ন করতেন। অর্থাৎ, তিনি আত্মীয়দের প্রীতি উৎপাদন করতেন। 'ঘোষঃ'- শব্দের কীর্তি ও মাহাত্ম্যের কীর্তন অর্থও হয়। 'স্বস্য স্বানাং বা'- নিজের বা গোপ-গোপীদের কীর্তি যেন বৃদ্ধি পায়, সেইভাবে যিনি নিজেই আনন্দকুণ্ডে, 'নিমজ্জন্তং'- পরমসুখ অনুভব করেন।

আবার বলছেন- 'তদীয়েশিতজ্ঞেষু'- (পূর্বোক্ত সেসব লীলার দ্বারাই) ভগবানের ঐশ্বর্য জ্ঞানী ভক্তদের মধ্যে, 'ভক্তৈর্জিতত্বং'- নিজ ভক্তদের নিকটেই যে তিনি সম্পূর্ণ পরাজিত অর্থাৎ নিজের ভক্তবশ্যতা 'আখ্যাপয়ন্তং'- তিনি নিজে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ ভক্তিপর সেবকদের নিকটই আমি পরাভূত হই; জ্ঞানীদের কখনও বশীভূত হই না। এর মাধ্যমে (ভা: ১০.১১.৯) শ্লোকের অর্থ সূচিত করা হচ্ছে- "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগতে ঐশ্বর্য জ্ঞানপর ভক্তদের জানান যে, তিনি তাঁর নিজস্ব সেবকদের দ্বারাই সম্পূর্ণ বশীভূত হন। টীকাকারও এই বাক্যের এরকমই অর্থ করছেন- 'তদ্বিদাং'- জ্ঞানীদের দেখাচ্ছেন (অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্যমার্গের সেবক এবং জ্ঞানী বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তদের চেয়েও মাধুর্যপর উন্নত-উজ্জ্বল রসের সেবকদের নিকট সর্বতোভাবে বশীভূত হন)।

অন্যরকম অর্থও করা যেতে পারে, ভগবানের ভক্তদের প্রভাব যারা জানেন, তাদের নিকটই সেটি জানান, অন্যদের জানান না। কারণ যারা বৈষ্ণব মাহাত্ম্য জানে না, কেবল জ্ঞানের চর্চা করেন, তাদের নিকট ভক্তি

অপ্রকাশিত। তাই এভাবেই, 'তদ্বিদাং'- এই পদের কৃষ্ণের ভক্তবশ্যতা গুণ প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব, 'প্রেমতঃ'- ভক্তির দ্বারা 'শতাবৃত্তি'- শত শত বার পুনরায়, 'তৎ বন্দে'- সেই ঈশ্বরকে বন্দনা করি।

সুতরাং ভক্তির অঙ্গস্বরূপ ভক্তদের অবশ্যকর্তব্য বন্দনাই- আমার প্রার্থনীয় (তোমাকে বন্দনা করতে চাই); কিন্তু ঐশ্বর্য-জ্ঞানাদি চাই না- এটাই প্রার্থনাকারীর ইচ্ছা।

ইতি-শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকৃত দিগ্‌দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ।

বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেহহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ! গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥৪॥

অনুবাদঃ হে দেব! তুমি সবরকম বরদানে সমর্থ হলেও আমি তোমার কাছে মোক্ষ বা মোক্ষের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক বা অন্য কোন বরণীয় বস্তু প্রার্থনা করি না, তবে আমি কেবল এই প্রার্থনা করি যে, এই বৃন্দাবনস্থ তোমার ঐ পূর্ববর্ণিত বালগোপালরূপী শ্রীবিগ্রহ আমার মানসপটে সর্বদা আবির্ভূত হোক। হে প্রভো! যদিও তুমি অন্তর্যামীরূপে সর্বদা হৃদয়ে অবস্থান করছ, তবুও তোমার ঐ শৈশব লীলাময় বালগোপাল মূর্তি সর্বদা সুন্দররূপে আমার হৃদয়ে প্রকটিত হোক।

দিগদর্শিনী টীকা: এখন ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা মুখে নিজের অভীষ্ট বস্তু প্রার্থনা করছেন- 'বরং'- ইত্যাদি দুটি শ্লোকের দ্বারা। 'দেব'- হে পরম দীপ্তিশীল! অথবা হে মধুর ক্রীড়াশীল! আপনি সব রকম বর দিতে পারলেও চার পুরুষার্থরূপ মোক্ষ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ); অথবা মোক্ষের চেয়েও অধিক সুখপ্রদ শ্রী বৈকুণ্ঠলোকও চাই না; এবং অন্য বর যা শ্রবণাদি নবধা ভক্তিযাজনের ফলে লাভ হয়ে থাকে- আপনি দিতে চাইলেও এবং এসব বর অন্যেও নিকট বরণীয় হলেও আমি সেগুলো চাই না।

এখানে মোক্ষাদির তিনটি বরের পর এই স্থিতিটির শ্রেষ্ঠত্ব আপনাআপনি প্রকাশ পাচ্ছে। মোক্ষ হতে বৈকুণ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব বৃহদ্ভাগবতামৃতের (উত্তর ১/১৪-১৫) শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। এবং বৈকুণ্ঠ লোক থেকে নববিধা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ভাগবতের (৩.১৫.৪৯) শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে- "সনৎকুমারাদি চতুঃসন প্রার্থনা করছেন- ভগবান! আমরা আপনার ভক্ত জয়-বিজয়কে অভিশাপ প্রদান করার জন্য যে অপরাধ করেছি, তাতে আমাদের যদি অত্যন্ত নিকৃষ্ট যোনিতে এমনকি নরকেও জন্মগ্রহণ করতে হয় তাতে ক্ষতি নেই- যদি আপনার অপ্রাকৃত গুণাবলির দ্বারা আমাদের কর্ণকুহর পূর্ণ থাকে। অর্থাৎ আমরা যদি নিত্যকাল আপনার গুণ শ্রবণ-কীর্তনের সৌভাগ্য লাভ করতে পারি।" এই উক্তির দ্বারা এটাই সূচিত হচ্ছে যে, শ্রবণাদি নবধা ভক্তি যথাযথরূপে যাজন করে সিদ্ধিলাভ করলে (নিজকর্ম ফলে) নরকাদি যেকোনও স্থানেই থাকি না কেন, সকল স্থানই তখন বৈকুণ্ঠ।

তাহলে মুনিবর কি বর কামনা করেছেন? তার উত্তরে বলছেন- "হে নাথ! এই বৃন্দাবনে আপনার গোপাল রূপটি যেন সবসময় আমার মনে আবির্ভূত থাকে। আপনি অন্তর্যামী, সর্ব-গুণময় প্রভৃতি সকলরূপে আমার অন্তরে থাকলেও বাহিরের সাক্ষাৎ দর্শন করার মতো অন্তরেও যেন সর্বদা সকল সৌন্দর্য প্রকাশ করে প্রকটিত থাকেন।

(স্বয়ং কৃষ্ণ যেন তাঁর ভক্তকে বলছে) ও হে! উক্ত মোক্ষাদি (তিনটি বরও সামান্যভাবে নয়) পরম উপাদেয়রূপেই সকলে গ্রহণ করে থাকে; অতএব তুমি তাই গ্রহণ কর? তার উত্তরে বলছেন, 'কিমন্যৈঃ'- অন্য মোক্ষাদির আমার কি-ই বা প্রয়োজন? যেহেতু কৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত আনন্দসমূহের সার নির্যাস। তাই তাঁকে পেলেই সবকিছু পাওয়া যাবে। আর তাঁকে না পেলে অন্যান্য তুচ্ছ বস্তু প্রাপ্ত হলে, কেবল দুঃখই সার হবে। অতএব, এছাড়া আমার আর কিছুই প্রয়োজন নেই।

'কিমন্যৈঃ'- এর অন্য অর্থ করা যেতে পারে, মোক্ষাদি বর প্রার্থনা না করলেও, পরম প্রার্থনীয় আমার চতুর্ভুজাদি (নারায়ণ) রূপ দর্শন ও বার্তালাপ করার বর গ্রহণ কর? তার উত্তরে বলছেন- অন্য কোন বরে আমার প্রয়োজন নেই। কারণ আমার চিত্তে আপনার এই সকল শোভা

শিরোমণি শ্রীমূর্তিটি প্রকাশিত থাকলেই অত্যন্ত আনন্দ অনুভূত হয়, অন্য কিছুতে তা হয় না। অন্তর্দর্শনের মাহাত্ম্য বৃহদ্ভাগবতামৃতের উত্তর ২/৮৬-৯৮ শ্লোকে শ্রী পিপ্পলায়ন-গোপকুমার সংবাদে বর্ণিত হয়েছে এবং অন্তরে দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠরূপে প্রার্থনা হেতু সত্যব্রত মুনির প্রার্থনাও যে তাই, এটাই এই স্তুতিতে প্রকাশিত হয়েছে।

ইতি-শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের চতুর্থ শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকৃত
দিগ্দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ।

ইদন্তে মুখাম্ভোজমত্যন্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ব-রক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদঃ হে দেব! তোমার যে বদন-কমল অতীব শ্যামল, স্নিগ্ধ ও রক্তবর্ণ কেশসমূহে সমাবৃত এবং তোমার যে বদনকমলস্থ বিম্বফলসদৃশ রক্তবর্ণ অধর মা যশোদা বারবার চুম্বন করছেন, সেই বদনকমলের মধুরিমা আমি আর কি বর্ণন করব? আমার মনোমধ্যে সেই বদন-কমল আবির্ভূত হোক। ঐশ্বর্যাদি অন্যবিধ লক্ষ লক্ষ লাভেও আমার কোন প্রয়োজন নেই– আমি অন্য আর কিছুই চাই না।

দিগ্দর্শিনী টীকাঃ 'অত্র চ'- আপনার শ্রীবিগ্রহের মধ্যেও পরম মনোহর শ্রীমুখকমলই বিশেষভাবে দর্শনীয়, এই ইচ্ছা পোষণ করার জন্যই বলছেন, 'ইদন্তে'- কদাচিৎ নিজ সমাধিতে দৃষ্ট সেই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য, এখন তিনি ব্যক্ত করছেন। আপনার মুখই পদ্ম অর্থাৎ প্রফুল্ল পদ্মের খনি, নিখিল সন্তাপ-হারী এবং পরমানন্দ রসময়। এহেন মুখ আমার হৃদয়ে বার বার প্রকটিত হোক।

সেই মুখপদ্ম কেমন? তা আবারো বলা হচ্ছে- পরম শ্যামল স্নিগ্ধ, লাল আভাযুক্ত ও বক্র কেশদ্বারা আচ্ছাদিত। অর্থাৎ পদ্মফুল যেমন ভ্রমরগণ দ্বারা বেষ্টিত থাকে তেমনি মুখপদ্মটিও কেশ দ্বারা আবৃত। গোপী শ্রীযশোদা তাকে চুম্বন করেন। সেই শ্রীমুখপদ্ম মহাসৌভাগ্যশালিনী শ্রী যশোমতী কর্তৃক বার বার চুম্বিত হলেও আমার মনে যেন তা একবারও

প্রকটি হয়। পূর্বশ্লোকের 'সদা' শব্দের এই শ্লোকের অনুবৃত্তির জন্য 'সর্বদাই যেন প্রকটি থাকে'- এই তাৎপর্যও গ্রহণ করা যেতে পারে।

সেই মুখপদ্মের আরেকটি বিশেষণ দেখানো হচ্ছে- 'বিম্বরক্তাধরং'- বিম্বফলের (লাল বর্ণের ফল বিশেষ) মতো রক্তবর্ণ ঠোঁটদ্বয় যাতে, সেই মুখপদ্ম (আমার মনে) প্রকটি হোক। তাহলেই আমি কৃতার্থ। অন্যথায় অন্যকিছু লক্ষ লক্ষ লাভে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

ইতি – শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের পঞ্চম শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকৃত
দিগ্দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ।

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ মামজ্ঞমেধ্যক্ষি দৃশ্যঃ ॥৬॥

অনুবাদঃ হে দেব! হে দামোদর! হে অনন্ত! হে বিষ্ণু! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে প্রভো! হে ঈশ্বর! আমি দুঃখপরম্পরারূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে একেবারে মরণাপন্ন হয়েছি, তুমি কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃত দ্বারা আমার প্রাণ রক্ষা কর।

দিগ্দর্শিনী টীকাঃ এরকম স্তুতির প্রভাবে প্রেমের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করছেন এবং সাক্ষাৎ দর্শনের ক্ষেত্রে শ্রীনাম সংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ উপায়- এটা মনে মনে স্থির করে, সেই রূপেই অর্থাৎ শ্রীনাম কীর্তন মুখেই (প্রণত হয়ে) কাতরতার সাথে প্রার্থনা করছেন- 'নমঃ'- ইত্যাদি। মূল শ্লোকে 'তুভ্যং'- শব্দটি অধ্যাহার (যোগ) করতে হবে। তিনি ভয়, গৌরব অথবা প্রেম বিকলতা যুক্ত হয়ে অর্থাৎ প্রেমের উদ্রেকে বিবশতার জন্য সাক্ষাৎভাবে 'তুভ্যং' অর্থাৎ 'তোমাকে' এই শব্দটি প্রয়োগ করেন নি।

হে প্রভো! হে আমার ঈশ্বর! (তোমাকে নমস্কার), তুমি প্রসন্ন হও। যেহেতু আমি 'দুঃখ-জালাব্ধি-মগ্নং'- অর্থাৎ বার বার জন্ম মরণাদিরূপ সাংসারিক দুঃখসমূহ অথবা তোমাকে না দেখার দুঃখ অসীম সমুদ্রতুল্যঃ

আমি নিজ কর্মদোষে তাতে ডুবেছি। এসব দুঃখের উৎপীড়নে আমি পীড়িত (সুতরাং আমার প্রতি প্রসন্ন হও)।

'এতিদীনং'- এই শব্দের অন্য অর্থ করা যায়- আমি সাধুসঙ্গ ও সহায়হীন এবং সাধন-ভজন বলে অত্যন্ত দীন, দরিদ্র অথবা আমি তোমাকে না দেখতে পেয়ে মৃত প্রায় বা জীবিত থেকেও মৃততুল্য। আবার দুঃখসমূহের প্রতিকার করার কোনো পন্থাই আমার জানা নেই।

অতএব আপনার কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃতবর্ষণ দ্বারা আমাকে দুঃখার্ণব হতে উদ্ধার করে পুনর্জীবিত করুন। পরবর্তী 'অক্ষিদৃশ্যঃএধি'- 'তুমি আমার নয়ন গোচর হও'- এই বাক্য দ্বারাও তাই প্রকাশ করছেন।

এই প্রার্থনা ক্রমান্বয়ে নিবেদন করা হয়েছে। তার মানে এই যে, প্রার্থিত বস্তুর দুর্লভত্বের জন্য প্রথমেই তার নির্দেশ করা অযৌক্তিক। অন্তরে দর্শনের চেয়ে সাক্ষাৎ দর্শনের মাহাত্ম্য শ্রীভগবৎ পার্ষদগণই যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। এটাও বৃহদ্ভাবতামৃতের উত্তর খন্ড (৩/১৭৯-১৮২) শ্লোকে বিশেষভাবে জানা যায়। (মূল শ্লোকের প্রথমেই কীর্তনাখ্য 'ভক্তি প্রকাশক দেব!' ইত্যাদি সম্বোধনাত্মক পদগুলো বর্ণনা করা হয়েছে) 'দেব!' হে দিব্যরূপ! সুন্দর! এটা দেখার ইচ্ছা জাগ্রত হবার জন্য। 'দামোদর! ভক্তবাৎসল্যের জন্য যিনি দামবন্ধন স্বীকার করেছিলেন। অতএব, আমিও ভক্তিদ্বারা তাঁকে নিজের চোখে দেখতে পাব। 'অনন্ত!'- যাঁর অন্ত নেই। (অর্থাৎ অসীম কৃপাময়)। সুতরাং তিনি কৃপাদৃষ্টি বিতরণে আমাকেও প্রার্থী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। 'প্রভো!'- হে অচিন্ত্য, অনন্ত অদ্ভূত মহাশক্তি সম্পন্ন! অতএব তোমার অপ্রাকৃত বিগ্রহকে আমার প্রাকৃত চক্ষু দিয়ে দেখতে পাব। 'ঈশ!' পরম স্বতন্ত্র! অযোগ্যজনের প্রতি এরকম অনুগ্রহ প্রকাশে কারোর অপেক্ষা নেই। 'বিষ্ণো!'- হে সর্বব্যাপক! অথবা হে বৃন্দাবনের নিকুঞ্জসহ নিভৃত গহ্বরাদিতেও প্রবেশকারী! তাই তোমাকে দেখার জন্য আমাকে দুরে যেতে হবে না।

এই সম্বোধন পদগুলোর অন্য অর্থ যথা- হে 'অনন্ত!' সীমারহিত, 'বিষ্ণো!' সর্বব্যাপী, তবুও 'দামোদর!' অর্থাৎ বাৎসল্যতাবশত আপনার

অকরণীয় কিছু নেই। অন্য সম্বোধনপদগুলোর অর্থ পূর্বের ন্যায় একরকম থাকবে।

ইতি – শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকৃত দিগ্‌দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ।

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহোমেঽস্তি দামোদরেহ ॥৭॥

অনুবাদঃ হে দামোদর! তুমি যেরকম গো অর্থাৎ গাভী-বন্ধন রজ্জুদ্বারা উদূখলে বদ্ধ হয়ে শাপগ্রস্থ নলকুবের ও মণিগ্রীব নামক কুবের পুত্রদ্বয়কে মুক্ত করতঃ তাদের ভক্তিমান্ করেছ, আমাকেও সেইরকম প্রেমভক্তি প্রদান কর।

দিগদর্শিনী টীকা: এরকম প্রেমের দ্বারা উৎকণ্ঠিত হয়ে সাক্ষাৎ দর্শনের প্রার্থনা করছেন। সেই প্রার্থনারূপ আকাঙ্ক্ষা হতেই প্রেমের অঙ্কুরের উৎপন্ন হয়; তা হতেই সাক্ষাৎ দর্শন যে কত দুর্লভ তা বুঝতে পারা যায়। তাই প্রেমভক্তিই সেই দর্শন লাভ করার একমাত্র উপায়। অথবা একমাত্র তাঁর দর্শন পেলে মনের তৃষ্ণা মিটবে না বরং পরক্ষণেই (না দেখতে পাবার জন্য) বিরহ দুঃখ পেতে হবে; এই ভয়ে ভীত হয়ে তাঁকে সবসময় বশীভূত করে রাখার জন্য প্রেমভক্তিই একমাত্র উপায়। এটা জেনেও আমার মতো অপরাধী কিভাবে এমন দুর্লভ বস্তু পেতে পারবে? এই ভয়ে ভীত হয়ে, আবার ভগবানের ভক্তবৎসল্যতার জন্য অসম্ভবও সম্ভব হয়ে থাকে, এই আশায় শ্লোকে মোক্ষ বাঞ্ছা পরিত্যাগ করে প্রেম ভক্তিই প্রার্থনা করছেন।

গোপী যশোদা কর্তৃক উদুখলে বাঁধা অবস্থাতেই আপনি কুবের পুত্রদ্বয়কে মুক্ত করেছিলেন। এতে যমলার্জুন নামক দুটি গাছের মধ্যে স্বয়ং প্রবেশ করায় পরম সুন্দর লীলা বিশিষ্ট ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন ও স্পর্শনের মতো পরম সৌভাগ্যই সূচিত হচ্ছে। কুবেরের পুত্র নলকুবের ও মনিগ্রীব নামক দুজনকে যেভাবে অর্থাৎ নিজে বাঁধা থাকা অবস্থাতেও

'মোচিতো'- শ্রীনারদের অভিশাপ ও সংসার থেকে মুক্ত করেছিলেন, শুধু মুক্তি নয়, প্রেমভক্তিও দিয়েছিলেন। 'ভক্তিং ভজতঃ'- যিনি ভক্তিকে পরম সাধ্য মনে করে আশ্রয় করেন এবং কোনভাবেই ত্যাগ করেন না, তাকেই ভক্তিভাক্ বলে। আপনি তাদেরকেও সেরকম করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০.১০.৪২) শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন, "আমার প্রতি তোমাদের উভয়ের পরম আকাঙ্খিত সেই প্রেম উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং কখনো সংসার দশা লাভ হবে না।" টীকাকার নিজেই অর্থ করেছেন- হে নলকুবের ও মনিগ্রীব তোমাদের 'ঈপ্সিত পরম ভাব' প্রেম আমাতেই উৎপন্ন হয়েছে, সুতরাং আর পুনর্জন্ম বা সংসার দুঃখ হবে না।

হে দামোদর ! সেরকমভাবে আপনার চরণাবিন্দ আশ্রয়রূপ স্বকীয় প্রেমভক্তিই আমাকে দিন। শ্রীকৃষ্ণ যেন বলছেন, ওহে! তোমরা প্রেমভক্তি কামনা করছ কেন? ওদের মতো মোক্ষই গ্রহণ কর, তা না হলে সংসার দুঃখ দূর হবে না? তার উত্তরে বলছেন- এই প্রেমভক্তিই আমি চাই, মোক্ষ প্রাপ্তিতে আমার আকাঙ্ক্ষা নেই। এর মানে- প্রেমভক্তির মাধ্যমে সংসার দুঃখ যদি নাশ হয় তবে হোক! আর যদি না হয়, তবে না হোক। এ সম্পর্কে আমার কোনো আগ্রহ নেই। এর নিগূঢ় ভাব এই যে- যদি চিন্তামনি পাওয়া যায়, তবে তো সব প্রয়োজনই সিদ্ধ হলো। তাই মুক্তির মতো তুচ্ছ দ্রব্যের আর কি প্রয়োজন?

অথবা হে দামোদর! আপনার স্বকীয় প্রেমভক্তি আমাকে বিশেষভাবে দান করুন। যে ভগবানের উদর রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ। তাঁর কাছে প্রেমভক্তি চাইতে গেলে তাঁর উদরে নিত্যই পাশ-বন্ধনের আগ্রহ জন্মাতে পারে। তাই বলছেন, পাশবন্ধন হতে আপনাকে মুক্ত করতে আমার কি আগ্রহ নেই? অর্থাৎ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এভাবেই আমার বাঞ্ছিত সেই সাধারণ প্রেমভক্তিটি প্রদান করুন।

অন্য অর্থ হতে পারে 'ইহ'- বৃন্দাবনে প্রেমভক্তি প্রদান করুন। শ্রীবৃন্দাবনেই প্রেমভক্তি সুখ পাওয়া যায়। এবং এখানেই সেই

প্রেমভক্তি প্রকট থাকে। তাই সেই দামোদর রূপেরই সাক্ষাৎ দর্শন প্রার্থনা করছেন এবং বৃন্দাবনেই সর্বদা বৃন্দাবনবিহারীরূপে ভগবানকে দেখার বাসনা করাতে, নিজেরও বৃন্দাবনে বাস করার প্রার্থনা সূচিত হচ্ছে।

ইতি-শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের সপ্তম শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকৃত দিগ্‌দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ।

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তি-ধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥৮॥

অনুবাদঃ হে দেব! তোমার তেজোময় উদরবন্ধন-রজ্জুতে এবং বিশ্বের আধার-স্বরূপ তোমার উদরে আমার প্রণাম থাকুক। তোমার প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে আমি প্রণাম করি এবং অনন্তলীলাময় দেব তোমাকে নমস্কার করি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা: এভাবে স্তুতি সমাপন করতে গিয়ে নিজের বাঞ্ছিত সিদ্ধির নিমিত্ত, অথবা ভক্তির উদ্রেকের জন্য ভগবানের অসাধারণ পরিকর, অবয়ব ও লীলাদির পৃথক পৃথকভাবে 'নমস্তেঽস্তু'- ইত্যাদি শ্লোকে প্রণাম করেছেন। আপনার উদর বন্ধনকারী এই মহাপাশটিকে নমস্কার করছি। এটি কেমন? সমস্ত তেজের আশ্রয়স্বরূপ। এতে সেই মহাপাশেরও (অসীম জ্যোতির্ময়) ব্রহ্মঘনরূপত্বই বক্তার বাঞ্ছনীয়, তা বুঝাচ্ছে।

তারপর আপনার উদরকে নমস্কার করি। যেহেতু সেই পাশবন্ধনের দ্বারাই আপনার উদরের সৌন্দর্য্যাদি এবং বাৎসল্য-লীলাদি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেই উদর কেমন? স্থাবর, জঙ্গম প্রপঞ্চজাত সমস্ত বিশ্বের আধার। যেহেতু সেই উদরের নাভি থেকেই চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়েছিল। সেই বাল্যলীলার সময় মাতা যশোমতীকে কৃষ্ণ দু'বার নিজের বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। তাই উদর বন্ধন দ্বারা সারা বিশ্বই বাঁধা পড়েছে। অর্থাৎ মাতা যশোমতী সমগ্র বিশ্বকেই বশীভূত করেছিলেন।

সর্বব্যাপক অসীম ভগবানের কখনো বন্ধন হতে পারে না; তবুও বন্ধন স্বীকারে নিজের ভক্তবাৎসল্য এবং এর দ্বারা জগতে নিসঙ্কোচ অবস্থিতি প্রভৃতির সমাবেশ যুক্তি তর্কের অগোচর। 'দাম' নমস্কারের পর 'উদর' কেননা উদরের উপরেই দাম বা রজ্জু অবস্থিত। অথবা পর পর শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্য প্রথমেই দামের পরে উদরের নমস্কার করা হচ্ছে।

এখন তাঁর প্রিয়তম জনের কৃপাতেই বাঞ্ছিত বস্তুর এমন কি, বাঞ্ছার অতীত দুষ্প্রাপ্য বস্তুও পাওয়া যেতে পারে। তাই তাঁর প্রিয়তমা ভগবতী শ্রীরাধিকাকে প্রণাম করেছেন। রাধিকার প্রণাম দ্বারা সমস্ত গোপীকারই প্রণাম করা হয়েছে। অথবা তাদের মুখ্যতমারূপে কেবল শ্রীরাধিকাকেই প্রণাম করছেন। 'রাধিকা'- যিনি ভগবানের আরাধনায় যুক্ত। আরাধনা থেকেই রাধিকা। সেজন্য 'ত্বদীয় প্রিয়ায়ৈ'- অর্থাৎ তোমার প্রিয়াকে নমস্কার করছি।

অথবা 'রাধিকা'- নাম রুঢ়ি শব্দ। সুতরাং আরাধনা ছাড়াও রাধিকা আপনার নিত্য প্রিয়া। আবার অর্থাৎ আপনি শ্রীরাধিকার নিত্য প্রিয়। এতে রাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই সূচিত হচ্ছে। সেই রাধিকার প্রিয়-আপনাকে নমস্কার। আপনি যাঁর প্রিয় হন, তিনিই জগতে বন্দনীয়। রাধিকাদেবী আপনারও প্রিয়। অতএব সেই রাধিকাকে নমস্কার করছি।

অতপর, স্তুতি শেষে রাধারাণীর সাথে রাসক্রিয়াদির পরমোৎসব বর্ণনা করার ইচ্ছা করেও সেটা পরমগোপ্য বস্তু বলে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত না করেই, 'মধুরেন সমাপয়েৎ'- সকল কাজই মধুরভাবে সমাপন করা কর্তব্য- এই ন্যায়ানুসারে কিঞ্চিৎ সংকেত প্রদান করেই 'নমোহনন্ত লীলায়' বাক্যে প্রণাম করছেন।

সেই লোকোত্তর দেব, সেই ভগবানকে নমস্কার। দামোদর কৃষ্ণের অলৌকিকতার দ্বারা তাঁর লীলাসমূহের অপ্রাকৃতত্ব অভিব্যক্তি হচ্ছে। অথবা শ্রীরাধার সাথে নিত্য ক্রীড়াশীল তোমাকে নমস্কার করছি। অতএব এরকম অনন্তলীলাময় তোমাকে নমস্কার। 'অনন্তলীলায়'- এই বিশেষণ দ্বারা গোকুল বিষয়ক সমস্ত লীলা যুক্ত বোঝায়। আপনার সেই সমস্ত লীলাকেও আমি নমস্কার করছি- এরূপ প্রকাশ পাচ্ছে।

ইতি - শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের অষ্টম শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকৃত দিগ্‌দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ।

দামোদর ব্রত সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় নির্দেশাবলি

শ্রীশ্রী হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে কার্তিক মাস তথা দামোদর মাস সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানেই কার্তিক মাসের ব্রত পদ্ধতি, করণীয়, বর্জনীয়, দীপদান প্রভৃতি বিভিন্ন কৃত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে সেগুলোই আলোচিত হলো। বামপার্শ্বস্থ সংখ্যা হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের শোকসংখ্যা জ্ঞাপক।

কার্তিক কৃত্যসমূহ

১। কার্তিক মাসের অধিষ্ঠাতৃদেব শ্রীরাধিকার সাথে শ্রীদামোদরে আমি প্রপন্ন হই। যাঁর প্রভাবে তাঁর প্রিয়তম কার্তিক মাস সেবিত হবেন।

২। স্কন্দ ও পদ্মপুরাণাদিতে কার্তিক কৃত্যাদি পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত আছে তথাপি এই গ্রন্থে একত্রে সংগ্রহ করে সারাংশ লিখতে হচ্ছে।

৩। এই কার্তিক মাসে বৈষ্ণব বিশেষতঃ নিত্য শ্রীদামোদরের অর্চন, প্রাতঃস্নান, দান ব্রতাদি করবেন।

৪। সেইরূপ বিশেষ বিশেষ দিনে যে শ্রীভগবৎ-পূজনাদি বিশেষ নিয়মে করবেন, তা পূর্বে বিচার পূর্বক লিখা হবে।

কার্তিকব্রতের নিত্যতা

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা-নারদ সংবাদে-

৫। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করে যে মানব কার্তিক ব্রতে বর্ণিত ধর্ম আচরণ না করেন, হে ধার্মিকবর তাকে মাতৃপিতৃ ঘাতক জানবেন।

৬। দামোদর প্রিয় কার্তিকমাস যে মানব ব্রতহীনভাবে অতিবাহিত করে, সে মানব সর্বধর্ম বর্জিত হয়ে পশুপাখি জন্ম লাভ করে।

৭। হে মুনিবর! যে মানব কার্তিক ব্রত না করে, সে ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, স্বর্ণচোর ও সর্বদা মিথ্যাবাদী।

৮। বিশেষতঃ যে বিধবা নারী কার্তিক ব্রত না করে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সে সত্যিই নরকে গমন করে।

৯। কার্তিক মাসে যে গৃহী ব্রত না করে, তার যজ্ঞদানাদি বৃথা হয় এবং কল্পকাল নরকবাসী হয়।

১০। কার্তিক মাস প্রাপ্ত হয়ে যে দ্বিজ ব্রত বিমুখ, দেবরাজসহ দেবগণ সকলে তার প্রতি বিমুখ।

১১। হে বিপ্রেন্দ্র! বহু যজ্ঞ দ্বারা পূজা করে এবং শতবার শ্রাদ্ধ করেও কার্তিকে ব্রত না করার ফলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না।

১২। কার্তিকে বৈষ্ণবব্রত না করার ফলে সন্ন্যাসী, বিধবা ও বিশেষতঃ বনাশ্রমী ব্যক্তি নরকে যায়।

১৩। হে বিপ্রবর! কার্তিকে যদি সে বৈষ্ণব ব্রত না করল, তার বেদসমূহ অধ্যয়নে কি ফল? এবং পুরাণসমূহ পাঠে কি ফল?

১৪। কার্তিক ব্রত না করায় জন্ম অবধি পুণ্য উপার্জন করলেও সে সকল পুণ্য ভস্মীভূত হয়।

১৫। কার্তিকে ব্রত না করলে যে উৎকৃষ্ট দান, সুমহান তপস্যা ও জপ সকলই বিফল হয়।

১৬। হে নারদ! কার্তিক মাসে উত্তম বৈষ্ণব ব্রত না করলে সপ্ত জন্মার্জিত পুণ্য বৃথা হয়।

১৭। হে মহামুনে! যারা কার্তিকে পবিত্র বৈষ্ণবব্রত না করে ইহলোকে সেই মানবগণকে পাপমূর্তি বলে জানবেন।

১৮। শ্রীবিষ্ণুর নিয়ম না করে যে ব্যক্তি কার্তিক মাস অতিবাহিত করে, হে নারদ সে জন্মার্জিত পুণ্যের ফল পায় না।

১৯। হে মুনে! নিয়মব্যতীত যে কার্তিক মাস যাপন করে এবং চাতুর্মাস্য ব্রত না করে, সে কুলাধম ব্রহ্মঘাতী।

২০-২২। হে শ্রীনারদ! যে বা যারা পিতৃপক্ষে পিতৃগণের পিণ্ডদান না করে, কার্তিকে ব্রত না করে, শ্রাবণী পূর্ণিমাতে ঋষিতর্পণ না করে। চৈত্রমাসে বিষ্ণুর দোল না করে, পবিত্র জলে মাঘস্নান না করে, পুষ্যানক্ষত্রে আমলকীব্রত না করে, শ্রাবণে জন্মাষ্টমী না করে, শ্রাবণদ্বাদশীতে সঙ্গমে স্নান না করে, সেই মূঢ়গণ কোথায় যাবে আমি তা জানি না।

পদ্মপুরাণে শ্রীনারদ-শৌনকাদি মুনিগণ-সংবাদে –

২৩। ভারতবর্ষে যে মানব কার্তিক মাস নিয়মব্যতীত অতিবাহিত করে, সে হাতে চিন্তামনি পেয়ে কাদাজলে নিক্ষেপ করে।

২৪। হে বিপ্রগণ! নিয়মব্যতীত যে ব্যক্তি কার্তিক মাস যাপন করে, তার প্রতি কৃষ্ণ বিমুখ, যেহেতু উর্জ্জব্রত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়।

কার্তিকে বিশেষস্নানদানাদি সৎকর্মের নিত্যতা

স্কন্দপুরাণে কার্তিকব্রত মাহাত্ম্যে

২৫। হে পুত্র! যারা কার্তিকে দান, হোম, জপ, স্নান ও শ্রীহরিব্রত না করে, সেই দ্বিজগণ নরাধম।

২৬। যারা কার্তিকে দান, হোম, জপ ও ব্রত না করল, সেই কারণে নিশ্চয়ই আত্মাকে বঞ্চিত করল, প্রার্থিত ফল পেল না।

২৭। হে নারদ! কার্তিক মাস প্রাপ্ত হয়ে যারা জনার্দনে ভক্তি না করল, পিতৃগণের সাথে যমপুরে তাদের বাস হয়।

২৮। যারা কার্তিকে ভক্তিভাবে কেশবদেবের অর্চনা না করল, তারা যমদূতগণ কর্তৃক বন্ধিত হয়ে নরকে গমন করবে।

২৯। সহস্র কোটি জন্মের সাধনের ফলে দুর্লভ মানবজন্ম প্রাপ্ত হয়ে যে কার্তিকে শ্রীবিষ্ণুর অর্চন করল না, তার জন্ম বিফলে গেল।

৩০। যার কার্তিক মাসে বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুকথা, বৈষ্ণবগণের দর্শন না হয় তার দশবার্ষিক পুণ্য নষ্ট হয়।

কার্তিক মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে কার্তিক প্রসঙ্গে–

৩২। সর্বতীর্থে যে স্নান, সর্বদানের যে ফল, কার্তিক মাসের কোটি অংশের একাংশেরও সমান হয় না।

৩৩-৩৪। একদিকে সর্বতীর্থ, দক্ষিণাসহ সর্বযজ্ঞ, পুস্করে বাস, কুরুক্ষেত্র ও হিমাচলে বাস, মেরুতুল্য সুবর্ণ দান। হে বৎস! অন্যদিকে সর্বদা কেশবপ্রিয় কার্তিক মাস।

৩৫। কার্তিকে শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যে কিছু পুণ্য করা হয়। হে নারদ! তোমার নিকট সত্য বলছি, তা সকল অক্ষয় হয়।

৩৬। মাস সকলের মধ্যে কার্তিক মাস নিশ্চয়ই উত্তম। পুণ্যগণের মধ্যে পরম পুণ্য, পবিত্রকারি গণের মধ্যে পরম পবিত্র।

৩৭-৩৮। হে নারদ! হে বিপ্রেন্দ্র! যেমন নদীসমূহের, পর্বতসমূহের, হে বিপ্রর্ষে! সমুদ্রসমূহের ক্ষয় জানা যায় না, সেই রকম হে ব্রহ্মণ্! হে মুনে! কার্তিক মাসে যে যৎকিঞ্চিৎ পুণ্য করা যায় তার ক্ষয় নাই, এই রকম পাপেরও ক্ষয় নাই।

৩৯। কার্তিকের সমান মাস নাই, সত্যযুগের সমান যুগ নাই, বেদের সমান শাস্ত্র নাই। গঙ্গার সমান তীর্থ নাই।

৪০। সর্বদা বৈষ্ণবগণের প্রিয় কার্তিক শ্রেষ্ঠ মাস। কার্তিকে উৎপন্ন সকল বস্তু বৈষ্ণবগণ ভক্তিপূর্বক সেবা করেন, হে মহামুনে! বৈষ্ণব নরকস্থ সকল পিতৃগণকে উদ্ধার করেন।

পদ্মপুরাণে কার্তিক মাহাত্ম্যে–

৪১। দ্বাদশ মাস মধ্যে কার্তিক মাস শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়। তাতে অল্প উপায়ন দ্বারা তিনি সম্যক্ পূজিত হয়ে বিষ্ণুলোক দান করেন, এই রকম আমি নিশ্চয় করেছি।

৪২। যেমন দামোদর ভক্তবৎসল সর্বজন বিদিত, তার এই দামোদর মাস সেইরূপ ভক্তবৎসল; স্বল্প সেবাকেও বহু করে নেন।

৪৩। দেহধারীগণের মধ্যে মানবদেহ দুর্লভ ও ক্ষণভঙ্গুর, তার মধ্যেও দুর্লভ কাল শ্রীহরিপ্রিয় কার্তিক মাস।

৪৪। কার্তিকে দ্বীপদান দ্বারা এই পরমেশ্বর শ্রীহরি প্রীত হন, পরদত্ত দীপ প্রবোধন ফলেও শ্রীহরি সুগতি দান করেন।

স্কন্দপুরাণে কার্তিক মাহাত্ম্যে –

৪৫। এই জগতে ব্রতসমূহের ফল মাত্র এক জন্ম অনুগমন করে কিন্তু কার্তিকে ব্রতের ফল শতজন্ম অনুগমন করে।

৪৬। হে বিপ্রেন্দ্র! কার্তিক ব্রতে মথুরায় অক্রুর তীর্থে সম্পূর্ণ উপবাস করে ও স্নান করে যে ফল প্রাপ্ত হয়, কার্তিকব্রতের নিয়ম শ্রবণ করেও সেই ফল প্রাপ্ত হয়।

৪৭। বারাণসীতে, কুরুক্ষেত্রে, নৈমিষারণ্যে, পুষ্করে ও অর্বুদতীর্থে গমন করে যে ফল লাভ হয়, কার্তিকে ব্রত করে সেই ফল লাভ হয়।

৪৮। সর্বদা যজ্ঞসমূহ দ্বারা যজন না করেও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ না করেও কার্তিকমাসে ব্রতদ্বারা বিষ্ণুধামে গমন করে।

৪৯। নিত্যভক্ষ্য দ্রব্যসমূহের মধ্যে কার্তিকে কিঞ্চিৎ নিয়ম করে সঙ্কোচ করলে নিশ্চয়ই পবিত্র কৃষ্ণসারূপ্য প্রাপ্ত হয়।

৫০। হে মুনিসত্তম! কার্তিকে ব্রত করলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র পাপার্জ্জিত কুজন্ম প্রাপ্ত হয় না।

৫১। হে মুনিশার্দুল! কার্তিকে নিজশক্তি অনুসারে বিষ্ণুব্রত শাস্ত্রবিধিমত যিনি করেন, সংসার-মুক্তি তাঁর হস্তগত।

৫২। সুপবিত্র কার্তিক মাসে দেব, ঋষি ও পিতৃগণের সেবিত ব্রত করলে অতি অল্পেও মানবগণের মহাফল লাভ হয়।

কার্তিকে কর্মবিশেষের মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে

৫৩। হে দ্বিজোত্তম! কার্তিকে অন্নাদি দান, হোম, তপস্যা, জপ যা কিছু করলে তা অক্ষয় ফলপ্রদ বলে কথিত।

৫৪। মানবগণ কর্তৃক কার্তিকে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যা কিছু প্রদত্ত হয় তাই অক্ষয় ফল হয়, বিশেষতঃ অন্নদান।

৫৫। যিনি এক সম্বৎসর পূর্ণ নিত্য হোম অনুষ্ঠান করেন, কার্তিকে যিনি স্বস্তিক রচনা করে থাকেন তিনিও তার সমান ফল পান, এতে সন্দেহ নাই।

৫৬। যে মানবী কার্তিকে শ্রীভগবানের মন্দিরে মণ্ডল রচনা অর্থাৎ আল্পনা দেন, তিনি স্বর্গাস্থিতা হয়ে কপোতীর ন্যায় শোভিতা হন।

৫৭। যে মানব কার্তিকে প্রতিদিন পত্রে ভোজন করেন, তিনি কল্পকাল দুর্গতি পান না।

৫৮। মানবগণ সারা জন্মার্জিত পাপসমূহ কার্তিকে পলাশ পত্রে ভোজন দ্বারা নাশ করতে পারে।

৫৯। কার্তিকে পলাশ পত্রে ভোজন দ্বারা মানব সর্বকামফল ও সর্বতীর্থ ফল লাভ করে এবং নরক দর্শন করে না।

৬০। হে মুনিসত্তম! সর্বকামপ্রদ পলাশ বৃক্ষ সাক্ষাৎ ব্রহ্মার অবতার, শূদ্রের পক্ষে মধ্যম পত্র বর্জন কর্তব্য, তাতে ভোজন করলে শূদ্র কল্পকাল নরকবাসী হয়।

৬১। কার্তিকে তিলদান, নদীতে স্নান, সৎকথা শ্রবণ, সাধুসেবন, পলাশ পত্রে ভোজন সংসার মুক্তিপ্রদ।

৬২। কার্তিকমাসে অরুণোদয়ে যে মানব দামোদরের অগ্রে জাগরণ করে, হে বিপ্রেন্দ্র! তিনি সহস্র গাভীদানের ফল লাভ করেন।

৬৩। হে মহামুনে! কার্তিকে রাত্রির শেষ প্রহরে শ্রীবিষ্ণুর নিকট যিনি জাগরণ করেন, ভগবদ্ধাম লাভ তার করতলগত।

৬৪। কলিযুগের কার্তিকমাসে সাধুসেবা, গোগ্রাস দান, শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণ ও অর্চন, রাত্রি শেষ প্রহরে জাগরণ দুর্লভ।

৬৫। জ্যৈষ্ঠ মাসে সহস্র জলধেনু দান এবং জলদান করে যে ফল লাভ হয়, কার্তিকে প্রাতঃস্নান করেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৬৬। কুরুক্ষেত্রে রবিবারে সূর্যগ্রহণে সন্নিহত্যা নামক হ্রদে যে স্নানফল, কার্তিকে একদিন স্নানে সেই ফল।

৬৭। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণপ্রিয় কার্তিকমাসে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্নজল যাই দান করবে তাই অক্ষয় হয়।

কার্তিকে শাস্ত্রালোচনার মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে

৬৮। যে মানব কার্তিকমাস গীতা শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা যাপন করে, হে শ্রীনারদ! তার সংসারে পুনরাগমন দেখি না।

৬৯। যে মানব কার্তিকে শ্রীবিষ্ণু মন্দির প্রদক্ষিণ করে সে পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হয়।

৭০। যে মানব কার্তিকে শ্রীহরির সম্মুখে নৃত্য, গীত, বাদ্য ভক্তিসহ করে, সে অক্ষয়পদ বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হয়।

৭১। কার্তিকে যে মানব শ্রীহরির সহস্রনাম স্তোত্র এবং গজেন্দ্রমোক্ষণ পাঠ করে তার সংসারে পুনর্জন্ম লাভ হয় না।

৭২। কার্তিকে শেষ রাত্রিতে যে মানব স্তবপাঠ ও গান করে, হে নারদ তিনি পিতৃগণসহ শ্বেতদ্বীপবাসী হন।

৭৩। কার্তিকে শ্রীহরির নৈবেদ্য দান ফলে, হে মুনিসত্তম! তিনি যব সংখ্যায় ততযুগ স্বর্গে বাস করেন।

৭৪। যিনি কার্তিকে কর্পূরসহ অগুরু, চন্দন, ধূপ কেশবের অগ্রে দান করেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তার যুগান্তে পুনর্জন্ম হয় না।

৭৫। যাঁরা কার্তিকে নিয়মপূর্বক ভক্তিভরে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন, শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোকপাদ হলেও তাঁরা শত গাভীদান ফল পান।

৭৬। হে মহামুনে! কার্তিকে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে ভগবৎসম্মুখে পবিত্র শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ কর্তব্য।

৭৭। হে মুনিশার্দ্দুল! কার্তিকে মঙ্গলার্থ বা লোভ বুদ্ধিতে যিনি হরিকথা কীর্তন করেন, তিনি শতকুল উদ্ধার করেন।

৭৮। যিনি কার্তিকে নিত্য শাস্ত্রচর্চায় যাপন করেন তিনি সর্বপাপ নিঃশেষে দগ্ধ করে অযুত যজ্ঞের ফল লাভ করেন।

৭৯। কার্তিকে শ্রীমধুসূদন শাস্ত্রকথা আলাপ দ্বারা যেমন তুষ্ট হন, দানসমূহ, যজ্ঞসমূহ, গো-দান, হস্তিদানাদি দ্বারা সে রকম তুষ্ট হন না।

৮০। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কার্তিকে যিনি হরিকথা শ্রবণ করেন, তিনি শতকোটি জন্মের আপদসমূহ থেকে নিস্তার পান।

৮১। হে মুনে! যিনি কার্তিকে যত্নসহ নিত্য শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশপুরাণ পাঠের ফল পান।

৮২। মানব ইষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞাদি, পূর্ত- কূপ জলাশয় খননাদি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কার্তিকে পরম ভক্তিপূর্বক বৈষ্ণবগণসহ বাস করবেন।

পদ্মপুরাণেও কার্তিকব্রত প্রসঙ্গে-

৮৩-৮৪। কার্তিকে যিনি ব্রহ্মচারী, ভূমিশায়ী, হবিষ্যভোজী, পলাশপত্রে ভোজনকারী, শ্রীদামোদরের অর্চন করেন, তিনি সর্বপাপ মুক্ত হয়ে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে শ্রীহরির নিকট ভজনানন্দে পরিপূর্ণ বিষ্ণু সদৃশ আনন্দভোগ করেন।

৮৫। পরিপূর্ণ কার্তিক মাসে প্রাতঃস্নানকারী, জিতেন্দ্রিয়, জপকারী, হবিষ্যভোজী ও বহিরিন্দ্রিয় সংযমকারী সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়।

৮৬। পূর্ণ কার্তিক মাসে যে মানব একবার ভোজন করে তিনি বীর, বহুতেজস্বী ও কীর্তিমান হন।

৮৭। যে মানব কার্তিকে পলাশপত্রে ভোজন করেন, তিনি পাপশূন্য হন, আর শ্রীহরির প্রসাদ নৈবেদ্য ভোজন করে সংসার মুক্ত হন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যরা পলাশ পত্রের মধ্যপত্র বর্জন করবেন।

৮৮। কার্তিকে প্রভু শ্রীহরি পূজিত হয়ে পূজকের সহস্র অপরাধ ও মহামহাপাতকসমূহ ক্ষমা করেন।

৮৯। শ্রীহরির প্রিয় মিছরি ও ঘৃতযুক্ত পায়েস নৈবেদ্য প্রসাদ ভক্তগণের সহ বিভাগ করে ভোজনকারী প্রতিদিন যজ্ঞসম ফল প্রাপ্ত হন।

পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যা সংবাদে-

৯০। কার্তিকে যে মানব স্নান নিশিজাগরণ, দীপদান, তুলসীবন পালন করেন, তারা শ্রীবিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করেন।

৯১। এইভাবে কার্তিকে তিনদিনও যাঁরা সেবা করেন, তাঁরা দেবগণেরও বন্দনীয়, আর যাঁরা আজন্ম ঐ সেবা করেন, তাঁদের আর কি বলব।

কার্তিকব্রতের অঙ্গসমূহ

পদ্মপুরাণে-

৯২। রাত্রিশেষে হরি জাগরণ, প্রাতঃস্নান, তুলসীবন সেবন, দীপদান, শেষে উৎসব উদ্‌যাপন- কার্তিকে এই সকল ব্রত।

৯৩। সম্পূর্ণ কার্তিক মাসে ব্রতকারী পাঁচটি ব্রত অঙ্গ পালন দ্বারা ভুক্তি মুক্তি ফল প্রাপ্ত হন।

৯৪। কার্তিকে হরি জাগরণ বিষ্ণুমন্দিরে, শিবালয়ে, অশ্বত্থমূলে বা তুলসীবনে করবে।

৯৫। কার্তিক-ব্রতী বিপদাপন্ন হয়ে স্নানের জন্য যখন জল না পাবেন, অথবা ব্যাধিবশতঃ স্নানে অসমর্থ হলে শ্রীবিষ্ণুর নাম দ্বারা মন্ত্র স্নান করবেন।

৯৬। ব্রতকারী হয়ে যিনি উদ্‌যাপন বিধি করতে অসমর্থ, তিনি ব্রত সংপূর্তির জন্য যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্বক ভোজন করাবেন।

৯৭। কার্তিকে দীপদানে অসমর্থ হলে পরের প্রদত্ত দীপকে উদ্দীপিত করবে অথবা যত্নসহকারে বাতাসাদি হতে পর দীপকে রক্ষা করবে।

৯৮। তুলসী সেবার অভাবে বৈষ্ণব দ্বিজকে পূজা করবেন, ব্রতী এ সকলের অভাবে ব্রত সম্পূর্ণের জন্য ব্রাহ্মণগণের, গাভীগণের বা অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের সেবা করবে।

কার্তিকে দীপদান মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে কার্তিক মাহাত্ম্যে

৯৯। কার্তিকে নিমেষার্দ্ধকাল দীপদান ফলে সহস্রকোটিকল্প অর্জিত বহু পাপ বিলুপ্ত হয়।

১০০। হে বিপ্রেন্দ্র! কার্তিকে কেশবপ্রিয় দীপদানের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, দীপদান দ্বারা পৃথিবীতে আর পুনর্জন্ম হয় না।

১০১। কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণে, চন্দ্রগ্রহণে নর্মদাতে যে স্নানফল, কার্তিকে দীপদানে তার কোটিগুণ ফল হয়।

১০২। কার্তিকে যার দীপ, ঘৃত বা তিলতৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়। হে মুনিবর তার অশ্বমেধ যজ্ঞে কি ফল?

১০৩। কার্তিকে জনার্দনে দীপদান ফলে মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, শৌচহীন সকলই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

১০৪। কার্তিকে কেশবের অগ্রে যিনি দীপ দান করেন, তার সর্বযজ্ঞ দ্বারা যজন ও সর্বতীর্থে স্নান হয়।

১০৫। কার্তিকে কেশবের যে পর্যন্ত দীপজ্যোতি প্রজ্জ্বলিত না হয়, সে পর্যন্ত পুণ্যসমূহ স্বর্গে, মর্ত্যে ও রসাতলে গর্জন করে।

১০৬-১০৭। হে দ্বিজ! পুরাকালীয় পিতৃগণ গাথা কীর্তিত হতে শোনা যায় আমাদের কুলে পৃথিবীতে পিতৃভক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, যে পুত্র কার্তিকে কেশবকে দীপদান দ্বারা প্রসন্ন করবে এবং চক্রপাণির প্রসাদে আমরা নিশ্চয়ই মুক্তি পাব।

১০৮। মেরু ও মন্দর পর্বত সদৃশ অশেষ পাপসমূহ করলেও কার্তিকে দীপদান প্রভাবে সর্বপাপ দগ্ধ হয়- এতে সন্দেহ নাই।

১০৯। কার্তিকে বাসুদেবের সম্মুখে গৃহে বা আয়তনে দীপদানে মহাফল বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়।

১১০। যিনি কার্তিক মাসে মধুসূদনের অগ্রে দীপদান করেছেন, তিনিই মনুষ্যলোকে জন্ম সার্থক করেছেন। তিনি ধন্য, তিনি কীর্তিমান।

১১১। কার্তিকে অতি অল্পকাল মাত্র দীপদানের যে ফল, তা যজ্ঞশত দ্বারা বা তীর্থশত স্নান দ্বারা প্রাপ্য নয়।

১১২। সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানহীন, আর সর্বপাপরত হলেও কার্তিকে দীপদান প্রভাবে পবিত্র হয়, এতে সন্দেহ নেই।

১১৩। হে নারদ! ত্রিভুবনে এমন কোন পাপ নাই, যা কার্তিকে শ্রীকেশবের অগ্রে দীপদান দ্বারা শোধন করতে পারে না।

১১৪। কার্তিকে শ্রীবাসুদেবের অগ্রে দীপদান করে সকল বাধা মুক্ত হয়ে নিত্যধাম প্রাপ্ত হয়।

১১৫-১১৭। যিনি কার্তিক মাসে কর্পূর দ্বারা দীপ প্রজ্জ্বলিত করেন, বিশেষতঃ দ্বাদশীতে তার পুণ্য তোমাকে বলছি। হে নারদ! তার কুলে যারা জন্মেছে এবং যারা জন্মাবে, আর যারা বহু অতীতে যাদের সংখ্যা নাই। তারা চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে দেবলোকে ইচ্ছামতো সুদীর্ঘকাল ক্রীড়া করে সকলে মুক্তিলাভ করবে।

১১৮। হে বিপ্রেন্দ্র! দ্যূতক্রীড়া ছলে কার্তিকে শ্রীহরিমন্দির যে ব্যক্তি আলোকিত করে, হে মহাভাগ! সে তার সপ্তপুরুষ পর্যন্ত কুলকে পবিত্র করে।

১১৯। কার্তিকে বৈষ্ণবগৃহে যে মানব দীপদান করে, তারও সর্বদা ধন, পুত্র, যশ, কীর্তি হয়।

১২০। যেমন মন্থন দ্বারা সর্বকোষ্ঠে অগ্নি দৃষ্ট হন, সেইরূপ দীপদান প্রভাবে ধর্ম সর্বত্র দৃশ্য হন- এতে সংশয় নাই।

১২১। হে বিপ্রেন্দ্র! নির্ধন ব্যক্তিরও আত্মবিক্রয় করে কার্তিকে পূর্ণিমা যাবৎ দীপদান কর্তব্য।

১২২। হে মুনে! কার্তিকে বিষ্ণুমন্দিরে যে মূঢ়ব্যক্তি দীপদান না করে সে বৈষ্ণব মধ্যে স্বীকৃত নয়।

নারদীয় পুরাণে শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনী সংবাদে–

১২৩। তোলযন্ত্রে একদিকে সর্ববিধ দান, অন্যদিকে কার্তিকে দীপদান উভয়কে সমান বলা হয় নাই, দীপ প্রদাতা অধিক পুণ্যবান।

পদ্মপুরাণে- ১২৪। কার্তিকে শ্রীহরিমন্দিরে যিনি অখণ্ড দীপ দান করেন, তিনি শ্রীহরিধামে দিব্যজ্যোতিঃ শ্রেষ্ঠ বিমানে ক্রীড়া করেন।

কার্তিকে পরদীপ প্রবোধন মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে-

১২৫। পিতৃপক্ষে অন্নদান দ্বারা, গ্রীষ্মকালে জলদান দ্বারা যে ফল, কার্তিকে পরদীপ উদ্দীপিত করলে মানবগণের সেই ফল লাভ হয়।

১২৬। কার্তিকে পরদীপ উদ্দীপিত ও বৈষ্ণবগণের সেবা দ্বারা রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

১২৭। শ্রীহরির গৃহে অন্যের প্রদত্ত দীপকে যারা উজ্জ্বল করে, হে মহারাজ! তারা যম-যাতনা থেকে নিস্তার লাভ করে।

১২৮। হে বিপ্রেন্দ্র! মহাযজ্ঞসমূহ দ্বারা যজন করলেও সেই ফল হয় না, কার্তিকে পরদীপ প্রবোধনে যে ফল উক্ত আছে।

১২৯। মুষিকা একাদশীতে পর প্রদত্ত দীপকে উজ্জ্বল করে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়ে সে পরাগতি প্রাপ্ত হয়েছিল।

শিখর দীপ মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে-

১৩০। শ্রীমন্দিরে কলসের উপরে যখন দীপ উজ্জ্বল হয়, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তখন পাপরাশি দ্রবীভূত হয়।

১৩১। যে মানবগণ ব্রাহ্মণগণকে সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবী দান করে, তার ফল শ্রীহরি মন্দিরের চূড়ায় প্রদত্ত দীপ দানের এক কলার সমানও নয়।

১৩২। যে ব্যক্তি সবৎসা দুগ্ধবতী কোটি ধেনু দান করে, তার ফল শ্রীহরিমন্দিরের চূড়ায় প্রদত্ত দীপের ফলের এক কলার সমান নয়।

১৩৩। হে মহামুনে! বৈষ্ণবগণের উদ্দেশ্যে সর্বস্ব দান করে যে ফল, শ্রীহরিমন্দিরের উপরে প্রদত্ত দীপদানের এক কলার সমান নয়।

১৩৪। হে মহামুনে! শ্রীহরিমন্দিরের শিখরের উপরে ও মধ্যে প্রদত্ত প্রদীপ যিনি মূল্য দ্বারা ক্রয় করেছেন, তিনি নিজ শতকুল উদ্ধার করেন।

১৩৫। কার্তিকে শ্রীকেশবদেবের আলোকদীপ্ত উচ্চতর প্রাসাদ মহাভক্তিসহ যারা দর্শন করেন, তাদের কুলে কেউ নরকবাসী হয় না।

১৩৬। বিষ্ণুদীপ প্রদানকারীকে স্বর্গে দেবগণ নিরীক্ষণ করতে থাকেন যে, কখন এই দীপদানকারী ভক্তসহ আমাদের মিলন হবে।

১৩৭। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কার্তিকে পূর্ণিমা পর্যন্ত শ্রীহরিমন্দিরের উপরে যিনি দীপদান করেন, তার পক্ষে ইন্দ্রপদ দুর্লভ নয়।

মন্দিরোপরি দীপমালা মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে কার্তিক-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে–

১৩৮। শ্রীহরিমন্দিরের বাহিরে ও অভ্যন্তরে দীপমালা যিনি রচনা করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদ।

১৩৯। যিনি শ্রীহরিমন্দিরে দীপমালা রচনা করেন, তার বংশে উদ্ভূত লক্ষপুরুষের নরক গমন হয় না।

১৪০। হে মুনে! শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের বাহির-ভেতর যিনি দীপযুক্ত করেন, তাঁর পরমধাম গমনকালে পথে দেবগণ দীপ হাতে অপেক্ষা করতে থাকে।

ভবিষ্যপুরাণেও–

১৪১-১৪৩। যিনি কার্তিকমাসে বিশেষত উত্থান একাদশী ও দ্বাদশীতে অতি সুন্দর দীপমালিকা রচনা করেন, তিনি দশ সহস্র সূর্যতেজ সদৃশ জ্যোতিদ্বারা দশদিক্ আলোকিত করে জ্যোতির্ময় বিমানে জগৎ আলোকিত করে বিষ্ণুলোকে গমন করেন এবং যত সংখ্যা প্রদীপ ঘৃতপূর্ণ করে শ্রীভগবানের জাগরণ করেন, তত সহস্রবর্ষ শ্রীবিষ্ণুলোকে বিরাজ করেন।

আকাশদীপ মাহাত্ম্য

পদ্মপুরাণে কার্তিক প্রসঙ্গে–

১৪৪। যে মানব কার্তিকে উচ্চ আকাশে প্রদীপ দান করেন, তিনি সর্বকুল উদ্ধার করে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।

১৪৫। যে মানব কার্তিকে শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আকাশে ও জলে দীপ দান করেন, তার যে ফল তা শ্রবণ করুন।

১৪৬। হে বিপ্রগণ– এইরূপভাবে যিনি দীপদান করেন, তিনি ধনধান্য, সমৃদ্ধিশালী, পুত্রবান্ ও ঐশ্বর্যশালী হন, তাঁর নয়নযুগল সুশোভন হয় এবং তিনি বিদ্বান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

১৪৭। কার্তিকমাসে বিপ্রগৃহে যিনি দীপদান করেন, মনীষিগণ বলেন– তাঁর অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল হয়।

১৪৮। চৌরাস্তায়, রাজপথে, ব্রাহ্মণ গৃহে, বৃক্ষমূলে, গোষ্ঠে, মাঠে, অরণ্যেও দীপদানে সর্বত্র মহাফল প্রাপ্ত হবে।

১৪৯। *আকাশ দীপ দান মন্ত্র*

পদ্মপুরাণে–

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোহনন্তায় বেধসে ॥

কার্তিকে আকাশে শ্রীরাধিকার সাথে দামোদরকে প্রদীপ দান করছি– শ্রীঅনন্তকে ও ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার করছি।

দেশবিশেষে কার্তিক মাহাত্ম্য

পদ্মপুরাণে–

১৫০। যে কোনও দেশে কার্তিকে স্নান ও দান বিশেষতঃ পূজাতে তা অগ্নিহোত্র সমফল।

১৫১। কুরুক্ষেত্রে কোটিগুণ ফল, গঙ্গায়ও তৎসম ফল, তার থেকে অধিক পুস্করে, হে ভার্গব! দ্বারকায়ও অধিক। কার্তিক মাসে স্নান ও শ্রীভগবৎপূজন শ্রীকৃষ্ণসালোক্যপ্রদ।

১৫২। হে মুনিগণ! মথুরা ব্যতীত, অন্যপুরী সকল তার সমান, যেহেতু মথুরা মণ্ডলেই শ্রীহরির দামোদর লীলা প্রকট হয়েছিল।

১৫৩। অতএব কার্তিকে মথুরায় শ্রীগোবিন্দের প্রীতিবর্দ্ধন, কার্তিকে মথুরাতেই চরম ফল প্রাপ্তি হয়।

১৫৪। যেমন মাঘে প্রয়াগতীর্থ, বৈশাখে জাহ্নবী, কার্তিকে মথুরা সেবা, তা থেকে উৎকর্ষ আর নাই।

১৫৫। কার্তিকে মথুরাতে মানবগণ স্নান করে দামোদরের পূজা করলে তারা কৃষ্ণসারূপ্যপ্রাপ্ত জানবেন, এ বিষয়ে বিচার কর্তব্য নয়।

১৫৬। হে বিপ্র! এই জগতে মানবগণের পক্ষে মথুরাতে কার্তিক মাস দুর্লভ। যেখানে পূজিত হয়ে দামোদর নিজরূপ ভক্তগণকে প্রদান করেন।

১৫৭। শ্রীহরি অর্চিত হয়ে অন্যত্র সেবিত ভক্তগণকে ভুক্তি মুক্তি দান করেন, এই শ্রীহরি কিন্তু ভক্তি দান করেন না, যেহেতু শ্রীহরির বশ্যকারী।

১৫৮। কার্তিকে মথুরামণ্ডলে একবারও শ্রীদামোদরের পূজা থেকে সেই ভক্তি কিন্তু অনায়াসে মানবগণ শ্রীহরি হতে লাভ করে।

১৫৯। শ্রীদামোদরদেব কার্তিকে মথুরামণ্ডলে মন্ত্র-দ্রব্য-বিহীন পূজাকেও স্বীকার করেন।

১৬০। যে পাপের মরণান্তেই বিনিষ্কৃতি হয় তার শুদ্ধির জন্য কার্তিক মাসে মথুরাপুরীতে হরিপূজাই সুনিশ্চয়, এই প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে উক্ত হয়েছেন।

১৬১। বালক ধ্রুব কার্তিকে মথুরামণ্ডলে শ্রীদামোদরের পূজা ও ধ্যান দ্বারা যোগিগণ দুর্লভ শ্রীভগবানকে শীঘ্র দর্শন প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

১৬২। পৃথিবীতে মথুরা সুলভা, সেই রকম প্রতিবছর কার্তিক মাস সুলভ, তথাপি এই জগতে মূঢ় মানবগণ ভবসমুদ্রে জন্মমরণ প্রবাহে ভাসছে।

১৬৩। যজ্ঞসমূহের কি প্রয়োজন, তপস্যার কি প্রয়োজন, অন্য তীর্থসমূহের সেবাতে কি প্রয়োজন? যদি কার্তিকে মথুরামণ্ডলে শ্রীরাধিকা প্রিয় রাধিকা অর্চিত হন।

১৬৪। সকল পবিত্র তীর্থ, নদ-নদী, সরোবর কার্তিকমাসে এই মথুরামণ্ডলে সকলেই বাস করেন।

১৬৫। কার্তিকে কেশবদেবের জন্মস্থানে যে মানবগণ একবার প্রবিষ্ট হয়, তারা পরম অব্যয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন।

১৬৬। কার্তিকমাসে মথুরাতে হরিপূজকের উপহাস উদ্দেশ্যে হরিপূজা দ্বারা দুর্লভ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন ভক্তিমান হয়ে পূজা করলে যে কি ফল, তা আর কি বলব।

এইভাবে কার্তিকমাসের কৃত্যসমূহ স্বতঃই প্রকাশিত হলো। তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষভাবে কার্তিক-কৃত্য-বিধি এখন লেখা হচ্ছে:

কার্তিক-কৃত্য-বিধি

আরম্ভ কাল নির্ণয়

শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সংবাদে, কার্তিকে মাহাত্ম্যে—

১৬৮। আশ্বিনমাসের যে শুক্লা একাদশী হবে বা পূর্ণিমাতে, নিরলসভাবে কার্তিকমাসের ব্রতসমূহ ঐ দিন হতে আরম্ভ করবে।

১৬৯। নিত্য শ্রীভগবানকে জাগরণ করাবার জন্য রাত্রির শেষ প্রহরে উঠে শুচি হয়ে শ্রীভগবানকে জাগিয়ে অনন্তর স্তোত্রপাঠ সহ প্রভুর আরতি করবে।

১৭০। বৈষ্ণববৃন্দ সহ আনন্দে বৈষ্ণবধর্মসমূহ শ্রবণ করে গীতবাদ্যাদিসহ প্রাতঃকালে প্রভু দামোদরদেবকে আরতি করবে।

১৭১। নদী আদি জলাশয়ে গিয়ে আচমনপূর্বক সংকল্প করবে। প্রভুকে প্রার্থনা জানিয়ে পরে তাঁকে যথাবিধি অর্ঘ্যদান করবে।

১৭২। সংকল্পমন্ত্র— *হে জনার্দন! হে দেবেশ! হে দামোদর! শ্রীরাধিকাসহ আপনার প্রীতির জন্য কার্তিকে আমি প্রাতঃস্নান করব।*

১৭৩। প্রার্থনা মন্ত্র— *হে দেবেশ! তোমার ধ্যানসহ এই জলে আমি স্নান করতে উদ্যত, হে দামোদর! তোমার প্রসাদে আমার পাপ বিনাশ যাক।*

১৭৪। অর্ঘ্যমন্ত্র— *আমি কার্তিক মাসে বিধিবৎ স্নানকারী, হে দামোদর! হে দনুজেন্দ্রনিসূদন আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর।*

১৭৫। হে হরে! নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত পাপশোষণ করে কার্তিক মাসে আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য রাধিকাসহ গ্রহণ কর।

১৭৬। নিজদেহকে তিলকদ্বারা লেপন করে শ্রীকৃষ্ণ নারায়াণাদি নাম উচ্চারণ পূর্বক স্নান করে নিজ বিধিমতে সন্ধ্যা উপাসনা করে গৃহে আগমন করবে।

১৭৭। দেবমন্দির অগ্রে মার্জনা করে স্বস্তিকমণ্ডল রচনা করে প্রভুকে তুলসী, মালতী, পদ্ম, অগস্ত (বক) পুষ্পাদি দ্বারা অর্চন করবে।

১৭৮। নিত্য বৈষ্ণব সঙ্গে ভগবৎ কথা সেবন, অহোরাত্র ঘৃত, দীপ বা তিল দ্বারা অর্চন করবে।

১৭৯। কার্তিক মাসে বিশেষ বিশেষ নৈবেদ্য অর্পন করবে, সেই রকম অষ্টোত্তর শত প্রণাম, যথাশক্তি একবার আহারাদি ব্রত আচরণ করবেন।

পদ্মপুরাণে কার্তিক প্রসঙ্গে—

১৮০। প্রাতঃকালে উত্থান শৌচাদি করে পবিত্র জলাশয়ে গিয়ে বিধিবৎ স্নান, অতপর দামোদর অর্চন কর্তব্য।

১৮১। কার্তিক ব্রতধারী মৌন অবলম্বনে ভোজন, ঘৃত দ্বারা বা তিল তৈল দ্বারা দীপদান কর্তব্য।

১৮২। বৈষ্ণববৃন্দসহ কৃষ্ণকথা আলাপ দ্বারা দিন যাপন, কার্তিক মাসে ব্রত সংকল্প পালন।

১৮৩। আশ্বিনে শুক্লপক্ষের হরিবাসরে আরম্ভ, অথবা পৌর্ণমাসি হতে অথবা তুলারাশি আগমে সংক্রান্তিতে আরম্ভ।

১৮৪। শ্রীবিষ্ণুর নিকট অখণ্ড দীপদান, দেবালয়ে, তুলসীতে, আকাশে উত্তম দীপ দান করবেন।

১৮৫। কার্তিকব্রতে মানব শ্রীদামোদরের প্রীতির জন্য রৌপ্য, দীপ, স্বর্ণদীপ, মুক্তাফলাদি দান করবেন।

১৮৬। হে ভাবিনি! কার্তিকমাসে কার্তিকব্রত গৃহে করবে না, বিশেষতঃ তীর্থে কার্তিকব্রত সর্বপ্রযত্নে করবে।

কার্তিকব্রতে বর্জনীয় দ্রব্যসকল

পদ্মপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে–

১৮৭। কার্তিক মাসে রাজমাষ (বরবটি) ও শিমসমূহ ভক্ষণ করলে, হে মুনিবর কল্পকাল নরকবাসী হয়।

১৮৮। কার্তিক মাসে যে ব্যক্তি কলমী শাক, পটল, বেগুন, আচার (চাটনি) ত্যাগ না করে, তাকে কল্পকাল নরকবাসী হতে হয়।

১৮৯। ধর্মাত্মা ব্যক্তি কার্তিক মাসে মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করবেন না।

১৯০। পরান্ন, পরশয্যা, পরধন, পরস্ত্রী–কার্তিকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষভাবে বর্জন করবেন।

১৯১। কার্তিক মাসে তৈল মর্দন, শয্যা, পরান্ন ও কাসার পাত্রে ভোজন ত্যাগ করলে পরিপূর্ণ ব্রতী হওয়া যায়।

১৯২। কার্তিক মাস উপস্থিত হলে পরান্ন দর্শন করে যে মানব বর্জন করে, প্রতিদিন কৃচ্ছ্রব্রতের ফল প্রাপ্ত হন।

পদ্মপুরাণে শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে–

১৯৩। কার্তিকে তৈল, মধু, কাসার পাত্র ও পঁচা বাসি অম্ল দ্রব্য, আচার ইত্যাদি বর্জন করবে।

১৯৪। হে সুভ্রু! মৎস্য, কচ্ছপ মাংস ঔষধ হিসেবেও অন্য মাংস ভক্ষণ করবে না। কার্তিকে মাংস ভক্ষণে চণ্ডাল হয়।

শ্রীরাধাদামোদর-পূজাবিধি

পদ্মপুরাণে কার্তিকব্রতে–

১৯৫। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, গোপিকাগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কার্তিকে শ্রীদামোদর নিকটে শ্রীরাধিকার পূজা করা উচিত।

১৯৬। ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ এবং তৎপত্নীকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভোজনাদি দান দ্বারা পূজা করা কর্তব্য।

১৯৭। হে বিপ্রগণ! কার্তিকে শ্রীরাধিকার সন্তোষের জন্য যিনি শ্রীরাধিকা প্রতিমাকে পূজা করে তার প্রতি শ্রীমান্ দামোদর হরি তুষ্ট হন।

১৯৮। কার্তিকে প্রতিদিন 'দামোদরাষ্টকম্' নামক স্তোত্র (সত্যব্রত মুনি কথিত) পাঠ করবে, তা দামোদরের অর্চন স্বরূপ ও শ্রীদামোদরের আকর্ষণকারী।

দামোদর ব্রতের (নিয়ম সেবা) সংকল্পঃ

'হৃষীকেনং হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে' সর্বান্তকরণে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তথা সেবাই ভক্তি। কিভাবে সময়ের সর্বোচ্চ উপযোগ করে ভগবানের সেবা করা যায় সেটাই দামোদর ব্রতের সংকল্প হওয়া উচিত। তবে সর্বাগ্রে এটা খেয়াল রাখা উচিত যে, নিয়মগুলো (সংকল্প) যেন লোকদেখানো বা শুধুই নিয়মমাত্র থেকে না যায়। ব্রতের সময়সীমা পর্যন্ত যেন সেগুলো পালনযোগ্য হয় সেটাও বিবেচনা করতে হবে। ইষ্টদেবের প্রীতিবিধানার্থ নানাবিধ ব্রতনিয়ম বা সংকল্প করা যেতে পারে। যেমন–

১। নিত্য মঙ্গলারতি দর্শন ও গুরুপূজায় অংশগ্রহণ।

২। নিত্য ভাগবত ক্লাসে যোগদান।

৩। হবিষ্যান্ন গ্রহণ।

৪। সন্ধ্যায় আরতিতে অংশগ্রহণ ও দামোদরের জন্য দীপদান।

৫। বেশি সংখ্যক হরিনাম জপ - (২৪, ৩২, ৪৮, ৬৪ বা তদুর্ধ্ব)

৬। সকাল-সন্ধ্যা প্রতিদিন তুলসী পূজা ও পরিক্রমা।

৭। তিনবেলা মন্দির পরিক্রমা।

৮। বেশি সংখ্যক গ্রন্থ প্রচার।

৯। প্রতিদিন 'দামোদরাষ্টকং' পাঠ।

১০। 'লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ', 'শ্রীমদ্ ভাগবত' প্রভৃতি গ্রন্থাদি পাঠ।

হবিষ্যান্ন

শ্রীশ্রী হরিভক্তিবিলাসের ১৩ অধ্যায়ের ১০-১৩ নং শোকে হবিষ্যান্নের উপাদান উলেখ করা হয়েছে:

নিম্নোক্ত উপাদানগুলো হবিষ্যান্ন তৈরীতে ব্যবহার করা যাবে- আতপ চাল, ঘি, কাওন, শ্যামা, সৈন্ধব লবণ, ননীপূর্ণ গোদুগ্ধ, পাকা কলা, কাল শাক, গম, ফল (স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে অবশ্যই কম বীজ পূর্ণ ফলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে) আম, কাঁঠাল, লাবালী ফল, কেয়া ব্যতীত সকল মূল, পিপলী, হরিতকি, আমলকি, নারঙ্গ, ইক্ষুদ্রব্য (গুড় ব্যতিত)। সর্বপ্রকার তেল পরিত্যাজ্য। নিম্নবর্ণিত দ্রব্যগুলো হবিষ্যান্নের অন্তর্ভুক্ত হলেও তা কার্তিক মাসে বর্জন করতে বলা হয়েছে: মুগ ডাল, তিল তেল, বেতো শাক, সাত্ত্বিক শাক, মুলা, জিরা ও তেঁতুল।

ধর্মদত্ত উপাখ্যান

পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে একবার পৃথু মহারাজ নারদ মুনিকে বললেন- হে মুনিশ্রেষ্ঠ, কার্তিক ব্রত পালনকারী পুরুষ যে প্রকার মহান ফল প্রাপ্ত হয়, তা আপনি বর্ণনা করুন। কারা এই ব্রত অনুষ্ঠান করে থাকে!

নারদ বললেন-- হে রাজন! পূর্বকালে ধর্মদত্ত নামে এক ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শ্রীবিষ্ণুব্রত পালন তথা নিষ্ঠাপূর্বক সর্বদা বিষ্ণুপূজায় তৎপর থাকতেন। তিনি দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রজপ করতেন এবং অতিথি সৎকার তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একদিন কার্তিক মাসে শ্রীহরির নিকট জাগরণ করার জন্য ভগবানের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করলেন; তখনও এক প্রহর রাত্রি বাকী ছিল। ভগবানের পূজার সামগ্রী নিয়ে যেতে যেতে ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে দেখলেন যে এক রাক্ষসী আসছে। তার আওয়াজ ছিল অত্যন্ত ভয়প্রদ। সারা শরীরে কাঁটা কাঁটা লোম, লক্ লক্ করছে জিব, নগ্ন শরীর থেকে গম্ভীর ঘর্ঘর শব্দ। ঐসব দেখে ব্রাহ্মণ ভয়ে শিউরে উঠলেন। তাঁর সারা শরীর কাঁপতে থাকল। রাক্ষসী সামনে এলে কোনো প্রকারে সাহস করে পূজার সামগ্রী ও জল নিয়ে অত্যন্ত ক্রোধে রাক্ষসীর উপর ছুঁড়ে মারলেন। হরিনাম স্মরণ করতে করতে তুলসী মিশ্রিত জল রাক্ষসীর গায়ে ছুঁড়ে মেরেছিলেন। এইজন্য সেই রাক্ষসীর সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে গেল। তখন সে তার পূর্বজন্মের কাহিনী স্মরণ করতে সক্ষম হয়ে বুঝতে পারল তার পূর্বকৃত কর্মের পরিণামেই তার এই দুদর্শা। সে ব্রাহ্মণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বলতে লাগল-- হে ব্রাহ্মণ! আমি পূর্বজন্মের কুকর্মের ফলে এই দশা প্রাপ্ত হয়েছি। এখন কিভাবে আমি উত্তম গতি লাভ করব আমাকে বলে দিন।

রাক্ষসীকে সম্মুখে প্রণাম করতে তথা পূর্বজন্মের কাহিনী বর্ণনা করতে দেখে ব্রাহ্মণ বড়ই আশ্চার্যান্বিত হলেন। তিনি রাক্ষসীকে বললেন--'কোন কর্মের ফলে তুমি এই দশাপ্রাপ্ত হয়েছ?' কোথা থেকে এসেছ? তোমার নাম কি? তোমার আচার আচরণই বা কিরকম ছিল? এই সমস্ত কথা আমাকে বলো।

সেই শাপমুক্ত রাক্ষসী তখন বলল- হে ব্রাহ্মণ! আমার পূর্বজন্মের কথা শ্রবণ করুন। সৌরাষ্ট্র নগরে ভিক্ষা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। আমি ছিলাম তাঁর পত্নী। আমার নাম ছিল কলহ। আমি খুবই ভয়ংকর স্বভাবের স্ত্রীলোক ছিলাম। আমি কথাবার্তাতেও কখনো নিজ পতিকে যথার্থ মর্যাদা দান করিনি। তার জন্য কখনো ভালো খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিনি। আমি সর্বদাই তাঁর আজ্ঞা অমান্য করতাম। আমি অত্যন্ত কলহপ্রিয় ছিলাম। আমার স্বামী ঐ ব্রাহ্মণ আমাকে নিয়ে সর্বদাই উদ্বিগ্ন ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমার পতি দ্বিতীয় এক স্ত্রীকে বিবাহ করবে বলে স্থির করলেন। তখন আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করি। তারপর যমদূতেরা এসে আমাকে বেঁধে পেটাতে পেটাতে যমলোকে নিয়ে গেল। যমরাজ আমাকে উপস্থিত দেখে চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করলেন-- 'চিত্রগুপ্ত! খাতা খুলে দেখ এ কিরূপ কর্ম করেছে! এর জন্য শুভকর্মের ফল মিলবে না অশুভ কর্মের?

চিত্রগুপ্ত বললেন– ধর্মরাজ! এই মনুষ্যটি কোনরকম শুভ কর্ম করে নাই, বরং নিজে মিষ্টান্ন আদি ভোজন করত কিন্তু তার পতিকে কোনকিছু দিত না। এখন একে বল্গুলী যোনিতে জন্মগ্রহণ করে নিজ বিষ্ঠা ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করতে হবে। এই স্ত্রীলোকটি সর্বদা তার স্বামীকে দোষ দিত এবং কলহপরায়ণতা ছিল এর প্রবৃত্তি। সেইজন্য তার পরের জন্মে শুকর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে দিন কাটাতে হবে। সে যে পাত্রে রান্না করত, সেই পাত্রেই ভোজন করত। সেই দোষের জন্য তারপরের জন্মে আপন সন্তান ভক্ষণকারী বিড়াল রূপে জন্মগ্রহণ করবে। তাছাড়া আপন স্বামীর জন্য এ আত্মহত্যা করেছে, সেইজন্য এই অত্যন্ত নিন্দনীয় স্ত্রীলোকটি এখন থেকে কিছুকাল প্রেত শরীরে অবস্থান করতে হবে। দুতেদের দিয়ে একে মরুপ্রদেশে পাঠানো দরকার যেখানে ও প্রেত শরীর ধারণ করে থাকবে। এরপর ঐ পাপিনী উক্ত তিন যোনিতে কষ্ট ভোগ করবে।

কলহ বলতে লাগল- বিপ্রবর! আমিই সেই পাপিনী কলহ, প্রেতশরীরে আমার পাঁচশত বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। আমি সর্বদাই নিজ কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত তথা ক্ষুধা পিপাসায় অত্যন্ত পীড়িত হয়ে

ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছি। একদিন ক্ষুধায় কাতর হয়ে এক বণিকের শরীরে প্রবেশ করি এবং তার সাথে দক্ষিণ দেশে কৃষ্ণা এবং বেণীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হই। সেখানে আসার পর যখন ঐ সঙ্গমের কিনারায় দাঁড়িয়েছি তখন শিব এবং বিষ্ণুর পার্ষদেরা তার শরীর থেকে বেড়িয়ে আমাকে বলপূর্বক সেখান থেকে বিতাড়িত করে দিল। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তখন থেকেই আমি ক্ষুধায় কষ্ট পেতে পেতে এদিক ওদিক ভ্রমণ করছি। ঠিক এই সময়ই আপনার ওপরে আমার দৃষ্টি পড়ে। আজ আপনার হাত থেকে তুলসী মিশ্রিত জলের স্পর্শে আমার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিপ্রবর আমাকে কৃপা করুন, এবং আমাকে বলুন আমি এই প্রেত শরীর তথা ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর তিন যোনিতে জন্মগ্রহণের যন্ত্রণা থেকে কিভাবে মুক্ত হব?

নারদ বললেন- কলহের এই সমস্ত কথা শুনে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধর্মদত্ত তার কর্মের পরিণাম বিচার করে বড় আশ্চার্যান্বিত এবং দুঃখিত হলেন। অনেক ভাবনাচিন্তার পরে আক্ষেপের সঙ্গে বললেন- তীর্থ, দান এবং ব্রত আদি শুভকর্মের দ্বারা পাপ নষ্ট হয় কিন্তু, তুমি এখন প্রেত শরীরে অবস্থান করছ, এই সমস্ত শুভ কর্মে তোমার অধিকার নেই। তবুও তোমার এই দুর্দশা দেখে আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে। আমি মনুষ্যজন্ম নিয়ে এখন পর্যন্ত কার্তিক ব্রত পালন করে যে পুণ্য সঞ্চয় করেছি, তার অর্ধেক তোমাকে তাই দান করলাম। সেই অর্ধেক পুণ্য নিয়ে তুমি উত্তম গতি প্রাপ্ত হও।

এই কথা বলে ধর্মদত্ত কলহকে শ্রীবিষ্ণুর দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র জপ করে শ্রবণ করাতে লাগলেন এবং তুলসী মিশ্রিত জলদ্বারা তার অভিষেক করলেন। তখন সেই রাক্ষসী প্রেত শরীর পরিত্যাগ করে দিব্যরূপময়ী এক দেবীতে পরিণত হলো। তাকে অগ্নির সমান উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সে এমনই অনুপম সৌন্দর্য্য লাভ করল যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী। তারপর সে ভূমিতে মস্তক নত করে সেই ধর্মদত্ত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগল- দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার কৃপায় আমি নরক যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেয়েছি। আমি পাপের সমুদ্রে ডুবে ছিলাম। আপনি আমার জন্য নৌকা সমান হয়ে আমাকে উদ্ধার করলেন। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন

সে যখন এইভাবে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা বলছিল সেই সময় দেখা গেল আকাশ থেকে দিব্যবিমান অবতরণ করছে যাতে শ্রীবিষ্ণুর মতো রূপ ধারণকারী শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদগণ রয়েছেন। কাছে এসে বিমানের দ্বারদেশে অবস্থানকারী পুণ্যশীল এবং সুশীল নামে দুই বিষ্ণুর পার্ষদ রাক্ষসী থেকে রূপান্তরিত সেই দেবীকে বিমানে ওঠালেন। ঐ সময় এরকম বিমান দেখে ধর্মদত্ত বড়ই আশ্চার্যান্বিত হলেন। তিনি বিষ্ণুরূপধারী পার্ষদের দর্শন করে তাঁদের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করতে দেখে পুণ্যশীল এবং সুশীল দুজনে তাঁকেও বিমানে উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁর প্রশংসা করতে করতে ধর্মীয় তত্ত্ব বলতে লাগলেন।

দুই বিষ্ণু পার্ষদ বললেন- দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ! কারণ তুমি সর্বদাই বিষ্ণু আরাধনায় যুক্ত। দীন দুঃখীদের দয়া করা তোমার স্বভাব। তুমি অত্যন্ত ধর্মাত্মা এবং শ্রীবিষ্ণুব্রত অনুষ্ঠান আদি পালনে নিষ্ঠাযুক্ত। তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আজ পর্যন্ত এই কল্যাণময় কার্তিক ব্রত পালন করেছ এবং তার অর্ধেক দান করার ফলে দ্বিগুণ পুণ্য লাভে সক্ষম হয়েছ। তুমি অত্যন্ত দয়ালু, তোমার কার্তিক ব্রত এবং তুলসীপূজন আদি শুভকর্মের ফল দান করার ফলে এই স্ত্রীলোকটি আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিকট গমন করছে। তুমিও এই শরীর অন্তে দুই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধামে যাবে এবং তাঁর সমান রূপ ধারণ করে সর্বদাই তাঁর (ভগবানের) কাছে বাস করবে। ধর্মদত্ত! যে ব্যক্তি তোমার মতো নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তিভরে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করবে, সে ধন্য এবং কৃতকৃত্য তথা এই সংসারে তার জন্মলাভ সার্থক। যিনি পূর্বকালে রাজা উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবকে 'ধ্রুবপদ' প্রদান করেছিলেন, সেই শ্রীবিষ্ণুকে যদি কেউ নিষ্ঠা সহকারে আরাধনা করে তাহলে সেই প্রাণীকে কেন তিনি কিছু প্রদান করবেন না?

ভগবানের নাম স্মরণ মাত্রেই দেহধারী জীব সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়। পূর্বকালে যখন গজরাজকে কুমির আক্রমণ করে ধরে রেখেছিল, সেই সময় সে শ্রীহরির নাম স্মরণ করে সেই সংকট থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের নিকট স্থান লাভ করেছিল এবং এখনো সে ভগবানের 'জয়' নামে পার্ষদরূপে বিখ্যাত। তুমিও শ্রীহরির আরাধনা করেছ, অতএব

তোমাকে অবশ্যই নিজসমীপে তিনি স্থান দেবেন। এই কার্তিক ব্রতে তুলসীমিশ্রিত জলের মাহাত্ম্য এমনই যে তা জীবের সর্ব পাপ বিনষ্ট করে তাকে ভগবদ্ধামে গতি লাভ করায়।

'দীপদান' এবং 'আকাশ দীপ' এর মহিমা

স্কন্দপুরাণে - পূর্বকালে দ্রাবিড়দেশে বুদ্ধ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিল খুবই দুষ্টা প্রকৃতির এবং দুরাচার সম্পন্না। ঐ স্ত্রীর সংসর্গে থাকার ফলে ব্রাহ্মণের আয়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। পতির মৃত্যুর পরেও ঐ স্ত্রীলোকটি আরও বিশেষভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। এমনকি লোকনিন্দার ভয় না করে সে নির্লজ্জের মতো ব্যবহার করতে লাগল। তার কোনো পুত্র বা ভাই ছিল না। সে সর্বদাই ভিক্ষার অন্ন ভোজন করত। নিজের হাতে প্রস্তুত না করে সর্বদাই পরের বাড়ি থেকে ভিক্ষা করে বাসি অন্ন খেত এবং অনেকসময় অপরের বাড়িতে রান্না করতে যেত। তীর্থযাত্রা আদি থেকে সর্বদাই দুরে থাকত। সে কখনও কোনো ভালো কথায় কর্ণপাত করত না। একদিন এক বিদ্বান তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণ তার গৃহে আগমন করল। যার নাম ছিল কুৎস। তাকে (ঐ স্ত্রীকে) ব্যভিচারে আসক্ত দেখে সেই ব্রহ্মর্ষি কুৎস বললেন- ওরে মূর্খ নারী! মনোযোগ সহকারে আমার কথা শ্রবণ কর। পৃথ্বি আদি পঞ্চভূত দ্বারা তৈরী এই রক্তমাংসের শরীর, যা কেবল দুঃখেরই কারণ, তুই তাকে যত্ন করছিস? এই দেহ জলের বুদবুদের মতো, একদিন যা অবশ্যই বিনষ্ট হবে। এই অনিত্য শরীরকে যদি তুই নিজ বলে মানিস্ তাহলে নিজের বিচার পূর্বক এই মোহ পরিত্যাগ কর। ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ কর এবং তাঁর লীলাকাহিনী শ্রবণ কর। এখন কার্তিক মাস আগত হবে, তখন ভগবান দামোদরের প্রীতি বিধানের জন্য, স্নান, দান আদি কর্ম করে গৃহে বা মন্দিরে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দীপ নিবেদন করে শ্রীবিষ্ণুকে পরিক্রমা করবে এবং তাঁকে প্রণাম করবে। এই ব্রত বিধবা এবং সৌভাগ্যবতী নারী উভয়েরই অবশ্য পালনীয়। যার ফলে সমস্ত প্রকারের পাপের শাস্তি তথা সকল উপদ্রব নষ্ট হয়। কার্তিক মাসে দীপদান নিশ্চিতরূপে ভগবান বিষ্ণুর প্রীতি বর্ধন করে।

এই কথা বলে ব্রাহ্মণ কুৎস অপর একটি গৃহে গমন করলেন। তখন ঐ ব্রাহ্মণী ব্রহ্মর্ষি কুৎসের এই রকম উপদেশ শ্রবণ করে নিজ কর্মের জন্য অনুতাপ করতে লাগল এবং সে স্থির করল যে সে অবশ্যই কার্তিক মাসে এই ব্রত পালন করবে। তারপর যখন কার্তিক মাস আগত হলো তখন সে পুরো মাস সূর্যোদয়ের সময় প্রাতঃস্নান তথা বিষ্ণুকে দীপদান সহ নিষ্ঠা সহকারে এই ব্রত পালন করল। তারপর কিছুকাল বাদে আয়ু শেষ হলে তার মৃত্যু হলো। তখন সে স্বর্গলোকে গমন করল এবং পরে মুক্তি লাভ করল। যে সমস্ত মানুষ কার্তিক ব্রত পালন ও দীপদান আদি সম্পন্ন করে তারা যদি এই ইতিহাস শ্রবণ করে তাহলে তারাও মোক্ষ লাভ করে।

ব্রহ্মা এরপর বললেন- নারদ! এখন আকাশ দীপের মহিমা শ্রবণ কর। কার্তিক মাস আগত হলে যিনি নিয়মিত ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নান করে আকাশদীপ দান করেন তিনি সমস্ত লোকের প্রভু এবং অন্তে মোক্ষ লাভ করেন। এইজন্য কার্তিক মাসে স্নান, দান আদি কর্ম করার সাথে সাথে ভগবান বিষ্ণুর মন্দিরে এই একমাস দীপদান করা অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ সুনন্দন চন্দ্রশর্মা নামক ব্রাহ্মণের পরামর্শ অনুসারে এই একমাস বিধিপূর্বক ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন। কার্তিক মাসে প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করে পবিত্র হয়ে কোমল তুলসীদল দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর পূজা এবং রাত্রিতে আকাশ দীপ দিতেন। দীপ প্রদানের সময় তিনি এই মন্ত্র পাঠ করতেন-

দামোদরায় বিশ্বায় বিশ্বরূপধরায় চ।
নমস্কৃত্যা প্রদাস্যামি ব্যোমদীপং হরিপ্রিয়ম্‌ ॥

'আমি সবেশ্বর এবং বিশ্বরূপধারী ভগবান দামোদরকে নমস্কার করে এই আকাশদীপ প্রদান করছি। যা ভগবানের পরম প্রিয়। হে দেবেশ্বর, এই ব্রতের ফলে যেন আপনার প্রতি আমার ভক্তি বর্ধিত হয়'- এইভাবে প্রার্থনা করে রাজা সুনন্দন দীপদান করতেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে পুনর্বার আকাশদীপ দিতেন। এইভাবে তাঁর প্রাতঃস্নান এবং ভগবান বিষ্ণুর পূজা নিয়মিত চলতে লাগল। মাসে শেষে ব্রতভঙ্গ করে আকাশ দীপের নিয়মের সমাপ্তি করলেন এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে এই বিষ্ণুব্রত পূর্ণ করলেন। এই পুণ্যের প্রভাবে রাজা এই পার্থিব জগতেই স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে এক লক্ষ বৎসর সুখ উপভোগ করলেন এবং

অন্তকালে স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর বিমানে আরূঢ় হয়ে চতুর্ভূজ (শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম দ্বারা সুশোভিত) বিষ্ণু সদৃশ রূপ লাভ করে মোক্ষ প্রাপ্ত হলেন।

তারপর তিনি বিষ্ণুলোকে ভগবানের সান্নিধ্যে সুখ ও আনন্দের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। সেই কারণে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে ভগবান বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় আকাশদীপ বিধিপূর্বক দান করা উচিৎ। এই সংসারে যে বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্য আকাশদীপ প্রদান করে, তাকে ক্রুর মুখ বিশিষ্ট যমরাজের মুখ দর্শন করতে হয় না। একাদশীতে সূর্যের তুলারাশিতে অবস্থান অথবা পূর্ণিমাতে লক্ষ্মী সহিত ভগবান বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্যই আকাশদীপ প্রদান করা চাই।

নমো পিতৃভ্যঃ প্রেতেভ্যো নমো ধর্মায় বিষ্ণবে।
নমো যমায় রুদ্রায় কান্তারপতয়ে নমঃ ॥

"পিতৃগণকে নমস্কার, প্রেতগণকে নমস্কার, ধর্মস্বরূপ বিষ্ণুকে প্রণাম, যমরাজকে নমস্কার তথা দুর্গম পথে রক্ষাকারী ইন্দ্রকে নমস্কার।"

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে যে মানুষ পিতৃগণের নিমিত্ত আকাশে দীপদান করেন, তার পিতৃগণ নরকে থাকলেও উত্তম গতি প্রাপ্ত হন। যে দেবালয়ে, নদীর তীরে, রাজপথে, তথা নিদ্রা যাবার স্থানে দীপদান করে সে সর্বতোভাবে লক্ষ্মীপ্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ বা অন্যজাতির মন্দিরে দীপ প্রজ্জ্বলন করে সে বিষ্ণুলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম উঁচু নিচু পথে দীপ দান করে সে কখনো নরকে পতিত হয় না। পূর্বকালে রাজা ধর্মনন্দন আকাশদীপ দানের প্রভাবে শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহন করে বিষ্ণুলোকে প্রস্থান করেছিলেন।

যিনি কার্তিক মাসে হরিবোধিনী একাদশীতে ভগবান বিষ্ণুর সম্মুখে কর্পূর দিয়ে দীপ প্রজ্জ্বলন করেন তাঁর কুলে উৎপন্ন সমস্ত মানুষ ভগবান বিষ্ণুর প্রিয় ভক্ত হন তথা অন্তঃকালে মোক্ষলাভ করেন। পূর্বকালে কোনো এক গোপ অমাবশ্যা তিথিতে ভগবানের মন্দিরে দীপ প্রজ্জ্বলন করে তথা বারংবার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করে রাজরাজেশ্বর হয়েছিলেন। এইভাবে

স্বয়ং ব্রহ্মা নারদ মুনির কাছে কার্তিক মাসে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়মিত দীপ দান ও আকাশদীপ দানের মহিমা ব্যক্ত করেছিলেন। সকলেরই এইভাবে কার্তিক মাসে দীপদান করা উচিত।

গুণবতী উপাখ্যান

একবার দেবর্ষি নারদ স্বর্গের কল্পবৃক্ষ থেকে একটি দিব্য পুষ্প সংগ্রহ করে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার অভিপ্রায়ে দ্বারকায় এলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে সাদর সম্ভাষণ পূর্বক পাদ্য, অর্ঘ প্রদান করে বসবার জন্য আসন প্রদান করলেন। আসন প্রদান করে নারদ সেই দিব্য পুষ্প ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান তখন ঐ পুষ্পটি তাঁর ষোল হাজার মহিষীর মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

তাঁর অন্যতমা মহিষী সত্যভামা কৌতুহলী হয়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে প্রাণনাথ, আমি পূর্বজন্মে কি এমন দান, তপস্যা বা ব্রত পালন করেছিলাম যার ফলে সত্যলোকে জন্ম নিয়েও তার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়ে আজ আপনার অর্ধাঙ্গিনী হতে পেরেছি?' এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্মিত হেসে সত্যভামাকে বললেন- 'প্রিয়ে, তুমি পূর্বজন্মে যা কিছু ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলে তার সমস্ত কিছুই আজ আমি তোমাকে বর্ণনা করছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর।'

সত্যযুগের শেষভাগে মায়াপুরীতে (হরিদ্বার) দেবশর্মা নামক অত্রিকুলজাত এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি ছিলেন সমগ্র বেদশাস্ত্রে পারঙ্গম এক বিদ্বান, অতিথিবৎসল, অগ্নিহোত্র ও সূর্যব্রত পালনে অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ন। প্রতিদিন নিয়মিত সূর্য আরাধনার ফলে তিনি সাক্ষাৎ সূর্যদেবের মতো জ্যোতি লাভ করেছিলেন, ফলে তাকে দ্বিতীয় সূর্যদেবরূপে ভ্রম হতো। তাঁর ছিল একটিই মাত্র সন্তান, গুণবতী নামক এক কন্যা। তাঁর সেই একমাত্র কন্যা গুণবতীকে তিনি চন্দ্র নামক তার এক শিষ্যের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ দেবশর্মা, চন্দ্রকে নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন আর সেই জিতেন্দ্রিয় চন্দ্রও দেবশর্মাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করতেন। একদিন দেবশর্মা ও চন্দ্র উভয়ে একসঙ্গে কুশ ও সমিধ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে হিমালয়ে গমন করলেন। সেখানে

কোনো এক অঞ্চলে ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে তারা হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর রাক্ষসের সম্মুখীন হলেন। রাক্ষসটিকে তাদের দিকে ধেয়ে আসতে দেখে তাদের সমস্ত কাঁপতে লাগল। তখন রাক্ষস এসে তাদের দুজনকেই মেরে ফেলল। তবে জীবনভর সূর্য আরাধনা ও অন্যান্য ধর্মকর্মাদি করার ফলে স্বয়ং ভগবান তাঁদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা মুক্তিলাভ করেছিলেন।

গুণবতী যখন শুনল যে তার পিতা ও পতি উভয়েই রাক্ষসের হাতে মারা গিয়েছে, তখন সে গৃহের সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করে তাঁর পিতা ও পতির পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করল। শান্তভাবে সত্য, শৌচাদি পালন পূর্বক নিজেকে বিষ্ণুর আরাধনায় সমর্পণ করে ঐ নগরীতেই সে বাস করতে লাগল। গুণবতী সারা জীবন গভীর নিষ্ঠাসহকারে বিধিপূর্বক দুটি ব্রত পালন করেছিল: একাদশী ব্রত ও কার্তিক ব্রত। ভগবান বলেছেন, এই দুটি ব্রতের ফলেই যেমন পুণ্য সঞ্চয় হয়ে ধনজন প্রাপ্ত হওয়া যায় তেমনি মোক্ষও লাভ হয়। স্বয়ং ভগবান আরও উল্লেখ করেছেন যে, কার্তিক মাসে সূর্যের তুলা রাশিতে অবস্থানকালে যে প্রাতঃস্নান করে, সে মহাপাপী হলেও মুক্তি লাভ করে। যে মানুষ কার্তিক মাসে স্নান, জাগরণ, দীপদান ও তুলসীসেবা পালন করে সে অবশ্যই ভগবান বিষ্ণুকে লাভ করতে সক্ষম হয়। এই সময় বিষ্ণুর মন্দির মার্জন বা ঝাড়ু দিয়ে, স্বস্তিক আদি নিবেদন করে যে বিষ্ণুর আরাধনা করে থাকে সে জীবন্মুক্ত স্তর লাভ করে। যে কার্তিক মাসের তিনদিন মাত্র এই ব্রত পালন করে সে দেবতাদেরও পূজনীয়। আর আজন্ম যে এই কার্তিক ব্রতের অনুষ্ঠান করে তার তো কথাই নেই।

গুণবতীও এইভাবে প্রতি বৎসর, আজন্ম কার্তিক ব্রত পালন করে যেতে লাগল। অবশেষে এক কার্তিক ব্রতের সময় সে জ্বরে পীড়িত হয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। তবুও ঐ জ্বরে পীড়িত অবস্থাতেও সে কোনো রকমে ধীরে ধীরে স্নান করার জন্য গঙ্গার তীরে উপস্থিত হলো। আর জলে নামা মাত্রই শীতে কাতর হয়ে কাঁপতে কাঁপতে গুণবতী সেই গঙ্গাতীরেই অচেতন হয়ে পড়ল।

গুণবতী এরপর দেখল আকাশ থেকে এক সুদৃশ্য বিমান নেমে আসছে। সেই বিমান গরুড় চিহ্নিত পতাকায় সুশোভিত এবং সেই বিমানে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী বিষ্ণু পার্ষদগণ রয়েছেন। বিমানটি তার কাছে এলে গুণবতী এক দিব্যরূপ ধারণ করে তাতে আরোহণ করল। আর তখন তাকে চামর দোলাতে দোলাতে সম্মান জ্ঞাপন করে ভগবানের পার্ষদগণ বৈকুণ্ঠে নিয়ে চললেন।

পরমেশ্বর ভগবান এরপর মহিষী সত্যভামাকে উদ্দেশ্য করে বললেন- "ব্রহ্মা আদি দেবতাদের প্রার্থনায় আমি যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করলাম, তখন আমার সমস্ত পার্ষদগণও আমার সঙ্গে এই পৃথিবীতে এসেছে। হে প্রিয়ে, এই যে সমস্ত যাদবগণকে দেখছ, এরা সকলেই আমার পার্ষদ, যারা আমার অত্যন্ত প্রিয়। যিনি পূর্বে গুণবতীর পিতা দেবশর্মা ছিলেন, সেই তিনিই এখন সত্রাজিৎ। গুণবতীর স্বামী চন্দ্র এখন অক্রুর, আর সত্যভামা তুমিই হচ্ছ সেই গুণবতী। কার্তিক ব্রত পালন করে তুমি আমার অত্যন্ত প্রসন্নতা বিধান করেছিলে। পূর্বজন্মে তুমি আমার মন্দিরের দ্বারে যে তুলসীবৃক্ষ রোপন করেছিলে, এখন তা এক কল্পবৃক্ষের রূপ ধারণ করেছে। পূর্বে কার্তিক মাসে তুমি যে দীপদান করেছিলে, তার প্রভাবে তোমার গৃহে আজ লক্ষ্মী অচলা হয়ে আছেন। আর তুমি যা কিছু ব্রত আদি করেছিলে তা সকলই তুমি বিষ্ণুকে পরম পতি জ্ঞানে নিবেদন করেছিলে। তাই তুমি আজ আমার পত্নী হয়েছ। যেহেতু তুমি মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কার্তিকব্রত পালনে অনড় ছিলে, তাই তার প্রভাবে তোমার থেকে আমার কখনও বিচ্ছেদ হবে না। উৎস- পদ্মপুরাণ।

মূষিক উপাখ্যান

পদ্মপুরাণে শৌনক সূত গোস্বামীকে বলেছেন, "হে সূত! কার্তিকব্রতের ফল কি? এটা না করলেই বা দোষ কি? আমার নিকটে কার্তিকব্রতের মাহাত্ম্য বলুন।" সূত বললেন, "হে মুনিশ্রেষ্ঠ! জৈমিনির প্রশ্নে ব্যাসদেব যা বলেছিলেন তা কীর্তন করছি। কার্তিক মাসে যে ব্যক্তি মৎস্য, তৈল ও মৈথুন ত্যাগ করে, সে বহুজন্মকৃত পাপ মুক্ত হয়ে হরিগৃহে গমন করে। যে নর কার্তিকমাসে মৎস্য ও মৈথুন ত্যাগ না করে, সে নিশ্চয়ই

প্রতি জন্মে অজ্ঞান স্থাবরাদি ও শূকর জন্ম লাভ করে। মানবগণ কার্তিকমাসে তুলসীপত্র দ্বারা জনার্দনের পূজা করলে পত্রে পত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। কার্তিকমাসে যে বকপুষ্প দ্বারা জনার্দনের পূজা করে সে হরির কৃপায় দেবগণেরও দুর্লভ মোক্ষ প্রাপ্ত। যে নর সর্পিসংযুক্ত (ঘৃত যুক্ত) অন্ন হরিকে দান করে সে সর্বপাপ মুক্ত হয়ে হরিমন্দিরে গমন করে। যে নর কার্তিকমাসে একটি পদ্মও যদি দান করে, সে পাপবর্জিত হয়ে অন্তে বিষ্ণুপদে গমন করে। যে নর হরিপ্রিয় কার্তিকমাসে প্রাতঃস্নান করে, যে সর্বতীর্থে স্নান করলে যে ফল, সেই ফল পায়। যে নর কার্তিকমাসে নভোমণ্ডলে দীপ দান করে, শ্রীহরি তার প্রতি সদা তুষ্ট থাকেন। যে জন কৃষ্ণমন্দিরে সঘৃত দীপ দান করে তার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণনা করছি, শ্রবণ কর।"

ত্রেতাযুগে বৈকুণ্ঠ নামে একজন শুচি ব্রাহ্মণ বাস করতেন। সেই দ্বিজ একদা কার্তিকমাসে শ্রীহরির পুরোভাগে ঘৃতপূর্ণ দীপ দান করে গৃহে গমন করলেন। সেই সময় এক মুষিক ঘৃত খেতে আরম্ভ করলে প্রদীপ উজ্জ্বল হলো; অমনি সে প্রাণভয়ে পলায়ন করল। পলায়ন কালে এক সর্প কর্তৃক দংশিত হয়ে সে প্রাণত্যাগ করল। তখন যমদূতগণ এসে তাকে রজ্জুবদ্ধ করে নিয়ে যাবার উপক্রম করল। অমনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভূজ বিষ্ণুদূতগণ স্বর্ণ নির্মিত এক বিমানে করে সেখানে আগমন করল। সেই দূতগণ দ্রুত পাশবন্ধন ছিন্ন করে যমকিঙ্করগণকে বলল, - 'হে মূঢ়গণ! এ মুষিক বিষ্ণুভক্ত; একে বৃথা বন্ধন করেছিস। যদি তোদের জীবনের আশা থাকে, তবে শীঘ্র প্রত্যাবর্তন কর।' এই কথা শুনে যমদূতগণ প্রকম্পিত কায়ে জিজ্ঞাসা করল, - ' হে বিষ্ণুদূতগণ! তোমরা একে কোন্ পুণ্যপ্রভাবে বিষ্ণুপুরে নিয়ে যাচ্ছ? এ মহাপাপী; যমালয়ে শাস্তি বিধানই এর কর্তব্য।' বিষ্ণুদূতগণ বলল, - 'এই মুষিক বাসুদেবের পুরোভাগে প্রদীপ বোধন (উষ্কিয়ে দেওয়া) করেছে; সেই কর্ম বশতই একে বিষ্ণুমন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি।'

যে ব্যক্তি অনিচ্ছায়ও বিষ্ণুর অগ্রে দীপের বোধন করে, সে কোটিজন্মার্জিত পাপ পরিহার করে হরির গৃহে গমন করে। কার্তিকমাসে একাদশী তিথিতে যে নর ভক্তি সহকারে প্রদীপ দান করে, তার পুণ্য আখ্যান করতে শ্রীহরি ভিন্ন আর কেউই সমর্থ নয়। যেজন হরির গৃহে ভক্তিপূর্বক ঘৃতপূর্ণ দীপ দান করে, তার সহস্র অশ্বমেধেই বা কি প্রয়োজন? অশ্বমেধকর্তা স্বর্গে গমন করে, কিন্তু কার্তিকে দীপদাতা হরিমন্দিরে বৈকুণ্ঠে গমন করে। বিষ্ণুদূতগণ মুখে এরূপ বাক্য শুনে সেই যমদূতগণ যথাস্থানে গমন করল। তখন বিষ্ণুদূতগণ সেই মুষিকের রথে আরোহণ করে বিষ্ণুমন্দিরে গমন করল। শত মন্বন্তর কাল সে বিষ্ণুসান্নিধ্যেই রইল। তারপর হরির কৃপায় সে মর্ত্যভূমে রাজকন্যা হয়ে জন্ম লাভ করল। সে পুত্রে-পৌত্রে সমাযুক্ত হয়ে চিরকাল সুখভোগ করল। পরিশেষে সে হরিসেবা-মাহাত্ম্যে ইহলোক হতে গোলোকে গমন করল। মর্তবাসী এই উত্তম দীপমাহাত্ম্য শ্রবণ করে সেই সর্বপাপে বিনির্মুক্ত হয়ে বিষ্ণুমন্দিরে গমন করে।

কলিপ্রিয়া উপাখ্যান

পদ্মপুরাণে সূত-শৌনক সংবাদে বর্ণিত আছে- পুরাকালে ত্রেতাযুগে শঙ্কর নামে সৌরাষ্ট্রদেশবাসী এক বৃষল (শূদ্র) ছিল। তার স্ত্রীর নাম কলিপ্রিয়া। সে সদা পতিকে অযোগ্য ভেবে পরপুরুষাকাঙ্ক্ষিনী হয়ে পতিকে উচ্ছিষ্ট দিত। মহামূঢ় নীচসঙ্গবশতঃ মদ্য-মাংস খেয়ে স্বামীকে তিরস্কার করত। 'ও মরে না কেন? ও মরলে আমি যথেচ্ছা ভোগ করব', এরকম বলত। হে দ্বিজ! সেই নিষ্ঠুরা হৃদয়ে এইরূপ বিচার করে তখন অসি দ্বারা স্বামীর মস্তক ছেদনপূর্বক এক জারের নিমিত্ত সঙ্কেতস্থলে গমন করল। সেখানে আগত জার পুরুষকে বাঘে খেয়ে ফেলছে দেখে সে রোদন করতে করতে মূর্চ্ছা গেল। সেই মূঢ়া কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'হায়! হায়! আমি স্বামীকে হত্যা করে পরপুরুষের জন্য এলাম; কিন্তু সেই জারকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। এখন কি করব! কোথায় যাব! আমি বিধাতা কর্তৃক বঞ্চিত হলাম।'

তারপর কলিপ্রিয়া স্বগৃহে ফিরে বিলাপ করতে লাগল- হে নাথ! আমি কি নিদারুণ কর্মই করেছি! কোন্ লোকেই বা যাব! হে স্বামী! একটিবার কথা বলুন। আমি তোমাকে কতইনা ভর্ৎসনা করেছি, কিন্তু তুমি আমার যেন কোনো অপরাধ নাই এমনভাবে ব্যবহার করেছ।'

এইরূপ বিলাপ করে সেই ভ্রষ্টা পতিচরণে প্রণামপূর্বক অন্য নগরে গমন করল। সে প্রাতে নর্মদায় স্নানপূর্বক বহুপুণ্যফলে বৈষ্ণবগণকে দেখতে পেল। আরও দেখল, নদীতে রমণীগণ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, নানবিধ ফল, মুখবাস ও শঙ্খনাদ মহোৎসব সহকারে ভক্তিযুক্তচিত্তে রাধাদামোদরের পূজা করছে। এই দেখে বিনয়ান্বিত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, হে স্ত্রীগণ! তোমরা কি করছ? স্ত্রীগণ বলল, 'হে মাতঃ! সর্বমাসোত্তম শুভ কার্তিকমাসে রাধাদামোদরকে পূজা করছি। এতে কোটিজন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে।' তা শুনে সেই যোষিৎ বলল, 'আমিও তোমাদের সাথে ঐরকম পূজা করব' বলে সে স্ত্রীগণের সঙ্গে পূজা করতঃ নির্মলা হয়ে পৌর্ণমাসীতে মারা গেল।

তারপর যমকিঙ্করগণ এসে ক্রোধে চর্মরজ্জু দ্বারা তাকে বন্ধন করল। তখন স্বর্ণময় বিমানে বিষ্ণুদূতগণ আগমন করে চক্রদ্বারা তাদের প্রহার করতে লাগল। সেই প্রহারে যমদূতগণ পলায়ন করল। অতঃপর সেই নারী বিমানে আরূঢ় বিষ্ণুদূতগণে বেষ্টিতা হয়ে বিষ্ণুমন্দিরে গমন করল। যে নারী বা পুরুষ কার্তিকে রাধাদামোদরের অর্চন করে, সে পাপমুক্ত হয়ে গোলোকাখ্য মনোহর ধামে গমন করে। ভক্তিসহকারে সমাহিত হয়ে যে নর বা নারী এই কাহিনী শ্রবণ করে তার কোটিজন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট হয়।

দীপাবলি

চৌদ্দ বছর বনবাসান্তে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও ভ্রাতা লক্ষণ, রাবণকে বিজয়াদশমী দিনে বধ করেন। আর এই দীপাবলি তিথিতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। অযোধ্যাবাসীগণ ভগবান রামচন্দ্রের প্রত্যাবর্তনে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। তাই ভগবদ্বিরহ অমানিশার ঘোর কালিমা ঘুচিয়ে তাঁরা আত্মহারা হয়ে গৃহচূড়ায়-বাতায়নে-মাঠেঘাটে নগরীর প্রাসাদে দীপমালিকা প্রজ্জ্বলন করে তাঁদের প্রভুকে বরণ করেছিলেন। সেই উৎসব স্মরণেই দীপাবলি উৎসব পালিত হয়। এই দিনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন লীলা সংঘটিত হয়।

শালগ্রাম-তুলসী বিবাহ

স্কন্দপুরাণে কার্তিক মাহাত্ম্যে শ্রীমতি তুলসীদেবীর বিবাহ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কার্তিক মাসে শুক্লা নবমীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্ববেদোক্ত বিধানে তুলসী দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। তাই, যে মানব এই দিনে শ্রীকৃষ্ণের উৎসব করেন, তার কন্যাদানের সুফল লাভ হয়। জিতেন্দ্রিয় মানব কার্তিক মাসে এই তিথিতে সুবর্ণদ্বারা ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি নির্মাণপূর্বক তুলসীদেবীর সাথে বিধিবৎ পূজা ও বৈবাহিক বিধি সুসম্পন্ন করেন। এরকম তুলসী বিবাহ দর্শন করলে আজন্ম সঞ্চিত পাতকাদি দুরীভূত হয় ও পরম মঙ্গল লাভ হয়। এদিন শ্রীমতি তুলসিদেবীকে লাল রংয়ের বস্ত্র ও সুরম্য মাল্য প্রদান করা উচিত।

রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের আবির্ভাব (বহুলাষ্টমী)

অরিষ্টাসুরকে বধ করার পর রাসনৃত্যের জন্য কৃষ্ণ গোপীদের কাছে এলেন। কিন্তু কৃষ্ণের সাথে মজা করার জন্য গোপীরা তখন পিছিয়ে যেতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, "তোমার পক্ষে আমাদের কাউকে স্পর্শ করা ঠিক নয়। কিছুক্ষণ আগেই তুমি একটি ষাঁড়কে হত্যা করেছ।" কৃষ্ণ বললেন, "সে তো একটি অসুর ছিল, যে কিনা ষাঁড় দেহকে আশ্রয় করেছিল।" গোপীরা বললেন, "সে যাই হোক না কেন,

তাকে হত্যা করে তোমার পাপ হয়েছে।" কৃষ্ণ তখন গোপীদের নিকট অনুনয়-বিনয় প্রদর্শন করে প্রায়শ্চিত্ত বিধান শ্রবণ করতে চাইলেন। গোপীরা বললেন, "ঠিক আছে, এজন্য তোমাকে একরাত্রের মধ্যে সমস্ত পবিত্র নদ-নদীতে স্নান করতে হবে।" কৃষ্ণ তখন পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে আঘাত করে একটি গর্ত সৃষ্টি করলেন এবং সমস্ত তীর্থকে আহ্বান করলেন। মুহূর্তের মধ্যেই সকল তীর্থ দিব্যদেহ ধারণ করে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে করতে জলব্রহ্মরূপে কুণ্ডে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণ তখন সেই কুণ্ডে অবতরণ করে তাঁর গলা পর্যন্ত জলে নামিয়ে বেশ কয়েকবার মাথা ডোবালেন এবং উঠে এসে গোপীদের বললেন, "হ্যাঁ; এখন আমি সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ। কিন্তু তোমরাও তো অপবিত্র, কেননা তোমরা কখনও ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোনো রকম স্নান, দান, ব্রত, তপস্যা করনি।" রাধারাণী বললেন, "তবে আমরাও পবিত্র হব। তোমার এই কুণ্ডের চেয়ে আরো ভালো কুণ্ড তৈরি করে, তাতে স্নান করব।" শ্যামকুণ্ডের অনতিদুরে পশ্চিমে অরিষ্টাসুরের খুড়ের আঘাতে সৃষ্ট একটি অগভীর খাঁদ ছিল। তখন রাধারাণী অন্যান্য গোপীদের সহায়তায় হাতের কঙ্কন ও বালা দিয়ে একটি বিরাট গর্ত করলেন। কিন্তু জল তো আসছে না। কৃষ্ণ তখন বললেন, "তোমরা আমার কুণ্ডের জল দিয়ে সেটিকে পূর্ণ করতে পার।" রাধারাণী জবাব দিলেন, "তুমি এই জলে স্নান করে জলকে কলুষিত করেছ। আমাদের এমন জল দরকার নেই।" তখন গোপীরা মিলে মানসী গঙ্গা (কৃষ্ণের মন থেকে সৃষ্ট) থেকে কলস ভর্তি করে জল আনতে থাকলেন। তখন শ্যামকুণ্ডের তীর্থগণ রাধারাণীর চরণে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "হে দেবী! আপনাকে ব্রহ্মা-শিবের মতো মহান দেবতারাও জানতে পারেন না। একমাত্র কৃষ্ণই আপনাকে জানেন। তাই তিনি চান যে, আপনারা ক্লান্ত হয়েছেন, আপনারা আপনাদের ঘাম ধৌত করুন। বস্তুত আমরা কৃষ্ণের আজ্ঞাতেই এই কুণ্ডে এসেছি। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করছি যেন, আপনার কুণ্ডে আশ্রয় পেতে পারি। তবেই তো জীবন সফল হবে।" সরল হৃদয়া রাধারাণী তখন সম্মত হলেন। তক্ষুণি শ্যামকুণ্ডের পাড় ভেঙ্গে তীর্থগণ রাধাকুণ্ডকে প্লাবিত করলেন। কৃষ্ণ তখন বললেন, "হে মানিনি রাধা, তোমার কুণ্ড আমার কুণ্ড থেকেও

দীপাবলি

চৌদ্দ বছর বনবাসান্তে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও ভ্রাতা লক্ষণ, রাবণকে বিজয়াদশমী দিনে বধ করেন। আর এই দীপাবলি তিথিতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। অযোধ্যাবাসীগণ ভগবান রামচন্দ্রের প্রত্যাবর্তনে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। তাই ভগবদ্বিরহ অমানিশার ঘোর কালিমা ঘুচিয়ে তাঁরা আত্মহারা হয়ে গৃহচূড়ায়-বাতায়নে-মাঠেঘাটে নগরীর প্রাসাদে দীপমালিকা প্রজ্জ্বলন করে তাঁদের প্রভুকে বরণ করেছিলেন। সেই উৎসব স্মরণেই দীপাবলি উৎসব পালিত হয়। এই দিনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন লীলা সংঘটিত হয়।

শালগ্রাম-তুলসী বিবাহ

স্কন্দপুরাণে কার্তিক মাহাত্ম্যে শ্রীমতি তুলসীদেবীর বিবাহ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কার্তিক মাসে শুক্লা নবমীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্ববেদোক্ত বিধানে তুলসী দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। তাই, যে মানব এই দিনে শ্রীকৃষ্ণের উৎসব করেন, তার কন্যাদানের সুফল লাভ হয়। জিতেন্দ্রিয় মানব কার্তিক মাসে এই তিথিতে সুবর্ণদ্বারা ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি নির্মাণপূর্বক তুলসীদেবীর সাথে বিধিবৎ পূজা ও বৈবাহিক বিধি সুসম্পন্ন করেন। এরকম তুলসী বিবাহ দর্শন করলে আজন্ম সঞ্চিত পাতকাদি দুরীভূত হয় ও পরম মঙ্গল লাভ হয়। এদিন শ্রীমতি তুলসিদেবীকে লাল রংয়ের বস্ত্র ও সুরম্য মাল্য প্রদান করা উচিত।

রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের আবির্ভাব (বহুলাষ্টমী)

অরিষ্টাসুরকে বধ করার পর রাসনৃত্যের জন্য কৃষ্ণ গোপীদের কাছে এলেন। কিন্তু কৃষ্ণের সাথে মজা করার জন্য গোপীরা তখন পিছিয়ে যেতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, "তোমার পক্ষে আমাদের কাউকে স্পর্শ করা ঠিক নয়। কিছুক্ষণ আগেই তুমি একটি ষাঁড়কে হত্যা করেছ।" কৃষ্ণ বললেন, "সে তো একটি অসুর ছিল, যে কিনা ষাঁড় দেহকে আশ্রয় করেছিল।" গোপীরা বললেন, "সে যাই হোক না কেন, তাকে হত্যা করে তোমার পাপ হয়েছে।" কৃষ্ণ তখন গোপীদের নিকট অনুনয়-বিনয় প্রদর্শন করে প্রায়শ্চিত্ত বিধান শ্রবণ করতে চাইলেন। গোপীরা বললেন, "ঠিক আছে, এজন্য তোমাকে একরাত্রের মধ্যে সমস্ত পবিত্র নদ-নদীতে স্নান করতে হবে।" কৃষ্ণ তখন পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে আঘাত করে একটি গর্ত সৃষ্টি করলেন এবং সমস্ত তীর্থকে আহ্বান করলেন। মুহূর্তের মধ্যেই সকল তীর্থ দিব্যদেহ ধারণ করে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে করতে জলব্রহ্মরূপে কুণ্ডে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণ তখন সেই কুণ্ডে অবতরণ করে তাঁর গলা পর্যন্ত জলে নামিয়ে বেশ কয়েকবার মাথা ডোবালেন এবং উঠে এসে গোপীদের বললেন, "হ্যাঁ; এখন আমি সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ। কিন্তু তোমরাও তো অপবিত্র, কেননা তোমরা কখনও ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোনো রকম স্নান, দান, ব্রত, তপস্যা করনি।" রাধারাণী বললেন, "তবে আমরাও পবিত্র হব। তোমার এই কুণ্ডের চেয়ে আরো ভালো কুণ্ড তৈরি করে, তাতে স্নান করব।" শ্যামকুণ্ডের অনতিদুরে পশ্চিমে অরিষ্টাসুরের খুড়ের আঘাতে সৃষ্ট একটি অগভীর খাঁদ ছিল। তখন রাধারাণী অন্যান্য গোপীদের সহায়তায় হাতের কঙ্কন ও বালা দিয়ে একটি বিরাট গর্ত করলেন। কিন্তু জল তো আসছে না। কৃষ্ণ তখন বললেন, "তোমরা আমার কুণ্ডের জল দিয়ে সেটিকে পূর্ণ করতে পার।" রাধারাণী জবাব দিলেন,"তুমি এই জলে স্নান করে জলকে কলুষিত করেছ। আমাদের এমন জল দরকার নেই।" তখন গোপীরা মিলে মানসী গঙ্গা (কৃষ্ণের মন থেকে সৃষ্ট) থেকে কলস ভর্তি করে জল আনতে থাকলেন। তখন শ্যামকুণ্ডের তীর্থগণ রাধারাণীর চরণে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "হে দেবী! আপনাকে ব্রহ্মা-শিবের মতো মহান দেবতারাও জানতে পারেন না। একমাত্র কৃষ্ণই আপনাকে জানেন। তাই তিনি চান যে, আপনারা ক্লান্ত হয়েছেন, আপনারা আপনাদের ঘাম ধৌত করুন। বস্তুত আমরা কৃষ্ণের আজ্ঞাতেই এই কুণ্ডে এসেছি। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করছি যেন, আপনার কুণ্ডে আশ্রয় পেতে পারি। তবেই তো জীবন সফল হবে।" সরল হৃদয়া রাধারাণী তখন সম্মত হলেন। তক্ষুণি শ্যামকুণ্ডের পাড় ভেঙ্গে তীর্থগণ রাধাকুণ্ডকে প্লাবিত করলেন। কৃষ্ণ তখন বললেন, "হে মানিনি রাধা, তোমার কুণ্ড আমার কুণ্ড থেকেও

বিখ্যাত হোক। আমি সর্বদা এখানে স্নান ও জলক্রীড়া করতে আসব। নিঃসন্দেহে এই কুণ্ড আমার কাছে তোমার মতোই প্রিয়।" রাধারাণীও বললেন, "আর আমি ও আমার সখীরাও তোমার কুণ্ডে স্নান করব এবং যদি কেউ পরম ভক্তি সহকারে তোমার কুণ্ডে স্নান করে বা তোমার কুণ্ডের তীরে বাস করে সে নিশ্চিতরূপে আমার অত্যন্ত প্রিয় হবে।" সেই রাত্রি থেকেই 'রাধাকুণ্ড' ও 'শ্যামকুণ্ড' আবির্ভূত হলেন। যিনি জীবনে একবারের জন্যও রাধাকুণ্ডে স্নান করবেন বা এর তীরে বসে ভজন করবেন, তিনি শ্রীমতি রাধীরাণীর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ করবেন।

গোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব

শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর 'গোপাল চম্পু' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন - শরতের ঠিক মাঝামাঝি আসে কার্তিক মাস। সেই সময় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ব্রজবাসীরা। সেই সময় তাঁরা ইন্দ্র পূজা করেন। ব্রজবাসীরা সবাই তাই অত্যন্ত ব্যস্ত। কৃষ্ণের বয়স তখন সাত বছর। তাঁর পিতা এবং অন্যান্য লোকেদের নানান কাজে ব্যস্ত দেখে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি করছো পিতা? তখন নন্দ মহারাজ বললেন যে, আমরা ইন্দ্রপূজা করছি। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন ইন্দ্র পূজা কেন করছো? নন্দ মহারাজ বললেন যে, দেখো, আমরা তো বৈশ্য, গোপজাতি। কৃষি এবং গোপালন হচ্ছে আমাদের জীবিকা। গো-পালনের জন্য আমাদের ঘাসের দরকার, চাষবাসের জন্য আমাদের বৃষ্টি দরকার। আর ইন্দ্র হচ্ছেন বৃষ্টির দেবতা। তাই আমরা ইন্দ্রের পূজা করি যাতে ইন্দ্র আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বৃষ্টি দান করেন। কৃষ্ণ বললেন, বাবা, সমুদ্রের মাঝখানে তো কেউ ইন্দ্র পূজা করে না, তাহলে সেখানে কেন বৃষ্টি হয়? নন্দ মহারাজ একটু চিন্তা করে দেখলেন যে তাইতো, আমরা ভাবছি ইন্দ্রকে পূজা করার ফলে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু অনেক জায়গায়তো ইন্দ্রপূজা হয় না, সেখানেও তো বৃষ্টি হয়। যেখানে জলের প্রয়োজন নেই, সেখানেও বৃষ্টি হয়। তখন নন্দ মহারাজ বললেন, দেখো এটা আমাদের চিরাচরিত প্রথা। সেই প্রথা অনুসারে আমরা ইন্দ্রপূজা করি। কৃষ্ণ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এই প্রথাটি শাস্ত্রীয়, না লোকাচার। নন্দ মহারাজ একটু ফাঁপরে পড়ে গেলেন, তিনি ভাবতে

লাগলেন কোন শাস্ত্রে আছে। তাই তিনি বললেন এটা লৌকিক আচার। কৃষ্ণ বললেন, দেখো বাবা, শুধু শুধু লৌকিক আচার করে আমাদের কি লাভ! আমাদের জীবিকা যে গোপালন, গাভী বর্ধনের জন্য আমরা গোবর্ধনের কাছে ঋণী, ইন্দ্রের কাছে নয়। চলো আমরা গোবর্ধনের পূজা করি। যদিও কৃষ্ণ সাত বছরের ছেলে, তবুও কৃষ্ণ যা-ই বলে নন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য সকলে তা মেনে নেন। তাই নন্দ মহারাজ এবং অন্যরা সকলে মিলে ইন্দ্রপূজার যে আয়োজন করেছিলেন, তা নিয়ে গোবর্ধন পূজা করতে চললেন।

সমস্ত আয়োজনগুলোকে জড়ো করা হলো, সেটা একটা পাহাড়ের রূপ ধারণ করলো। সেই পাহাড়টি ছিলো অন্নের পাহাড়। অন্নকূট, অন্নের পাহাড়। তাতে প্রথমে দেওয়া হলো রুটি, লুচি, তার উপরে দেওয়া হলো অন্ন। বিভিন্ন রকমের অন্ন যেমন সাদা অন্ন, লাল অন্ন, নীল অন্ন, হলুদ অন্ন, সবুজ অন্ন ইত্যাদি। যত রকমের সবজী হয়েছিল সেগুলো দিয়ে সাজানো হলো। তারপর সেই পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘি-এর ঝর্ণা বইতে লাগলো। এইভাবে সমস্ত অন্নকুট বা অন্নের পাহাড়টি গোবর্ধনকে নিবেদন করা হলো। তখন সবাই দেখলো, একদিকে এক ছোট কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, আর অন্যদিকে গোবর্ধনের জায়গায় এক বিশাল কৃষ্ণ অবস্থান করছেন, যে অন্নগুলো হাত দিয়ে তুলছে, সেই জায়গাটা আবার পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে এক কৃষ্ণ খাচ্ছে, আরেক কৃষ্ণ দেখছে। এরকমও উল্লেখ আছে যে, কখনও কখনও ঐ গোবর্ধন কৃষ্ণ বলছেন আরও নিয়ে এসো, আমার আরও লাগবে। তখন সকল গোপেরা আরও অনেক কিছু খাবার নিয়ে এসে কৃষ্ণকে দিচ্ছে। এইভাবে খাওয়া শেষ হলে গোবর্ধনের ঝর্ণা থেকে জল খেয়ে কৃষ্ণ ঢেকুর তুললেন। এইভাবে তাঁর খাওয়া সমাপ্ত হলো। এভাবেই গোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসবের সূচনা হলো।

পরবর্তীতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার পর আবারো অন্নকূট মহোৎসব চালু করেন।

গো-পূজা ও গো-ক্রীড়া

এই দিন নন্দমহারাজ পুত্র কৃষ্ণকে গোবৎসদের দেখাশোনা করতে প্রদান করেন। সেই উৎসব স্মরণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এদিন গোমাতা ও গোবৎসদের পূজা করে থাকে। **ওঁ গবে নমঃ** মূলমন্ত্রে দশোপচারে গোমাতার পূজা করা যায়।

প্রণাম মন্ত্রঃ

ওঁ নমো গোভ্যঃ শ্রীমতিভ্যঃ সৌরভেভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মা সূতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীবলিদৈত্যরাজপূজা

পদ্মপুরাণে- মহাত্মা দৈত্যরাজ বলি মিথ্যাবাক্যের ভয়ে ভীত হয়ে বামনদেবকে দেহ পর্যন্ত অর্পণ করেছেন। শ্রীবামনদেবও কঠোরভাব প্রকাশ করে বলিকে বন্ধন করেছেন। এরপর বন্ধন করে পাতালে আনার সময় সুধী দৈত্যরাজ বিমনা ও খেদযুক্তচিত্ত হয়েও শ্রীহরিকে দোষ দেন নাই, কারণ দেহ এবং দেহিক বস্তুতে অহং মমতা ভাবশূণ্য ছিলেন। তখন শ্রীহরি তার প্রতি প্রীত হয়ে বলেছিলেন যে, বলি যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হবেন। আরও বলেছিলেন- যে সকল ব্যক্তি অবেদজ্ঞকে দান করে, মন্ত্রহীন হোম করে, ব্যগ্রচিত্তে জপ করে, আর কার্তিকে শুক্লা প্রতিপদ্‌দিনে তোমাকে অর্চন না করে তাদের সুকৃতপুণ্য তোমার প্রাপ্য হোক। এইভাবে শ্রীহরি দৈত্যরাজ বলিকে বর প্রদান করায় ঐ দিনে অবশ্য বলিরাজ সানন্দে পূজনীয়, আর শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সান্নিধ্য লাভ করায়ও যত্নসহকারে বলিরাজ পূজনীয়। আনন্দ সহকারে সর্বালঙ্কারে ভূষিতা বিন্ধ্যাবলী এবং কুষ্মাণ্ড, ময়দানব, জম্ভোরু, মুরদানবসহ উত্তম কুণ্ডল শোভিত দৈত্যরাজ শ্রীবলিমহারাজকে চিত্রপটে লিখে দিনের প্রাতঃভাগে পূজা করবে।

যমদ্বিতীয়া বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

স্কন্দপুরাণ ও পদ্মপুরাণে বলা আছে কার্তিকমাসে শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে মধ্যাহ্নে যমরাজের পূজা করলে ও যমুনাতে স্নান করলে যমলোক

দর্শন হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐ দিন নিজ গৃহে ভোজন করবে না, স্নেহযুক্ত হয়ে পুষ্টি বর্ধন নিমিত্ত বোনের হাতে ভোজন কর্তব্য। শাস্ত্রবিধানানুসারে ভগিনীগণকে নানা বস্ত্র দান করবে, ভগিনীগণকে পূজা করবে, সম্মান করবে। নিজ ভগ্নি অভাবে বৈমাত্রেয় ভগিনীগণকে পূজা করবে।

গোপাষ্টমী বা গোষ্ঠাষ্টমী

কার্তিক মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পৌগণ্ড বয়স প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ নিজে গোচারণ করার জন্য বারবার নন্দ মহারাজের নিকট প্রার্থনা করছিলেন। কিন্তু মাতা যশোমতী এতে দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করতেন। অবশেষে গোপাষ্টমী দিনে নন্দমহারাজ গ্রামবাসীদের ডেকে একটি উৎসব আয়োজন করেন। তখন একসাথে কৃষ্ণ-বলরামাদি গোপবালকদের শৃঙ্গ, বেত্র, বিষাণ, বাঁশী ও গো-বন্ধন রজ্জু প্রদান করেন ও পুরোহিতদের দ্বারা গাভীদের পূজা করেন। মাতা যশোদা কৃষ্ণের কপালে তিলক শোভিত করে দেন এবং কৃষ্ণকে গোষ্ঠে যেতে অনুমতি প্রদান করেন।

মেয়েদের গোষ্ঠে যেতে নেই। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র এদিন প্রথম গোষ্ঠে বেরিয়েছেন। তাই শ্রীমতি রাধারাণীও সুযোগ খুঁজছেন কিভাবে বের হওয়া যায়। গোপীকারা দেখলেন যে শ্রীমতি রাধারাণীকে দেখতে অনেকটা সুবলের মতো। তাঁরা রাধারাণীকে সুবলের মতো ধুতি-পোশাক পরিয়ে এবং নিজেরাও গোপবালকদের মতো সজ্জিত হয়ে কৃষ্ণের সাথে মিলিত হলেন।

তাই এদিন শ্রীমতি রাধা ঠাকুরাণী ও অন্যান্য সখীরা তাদের শ্রীচরণ দর্শন দান করেন। ভক্তদের উচিত এদিনে গাভীদের শিং গুলো হলুদ দিয়ে রং করা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া ও গায়ে - হাতের ছা দেওয়া। এদিন গাভীদের উত্তম ঘাস ও ফলমুল সেবন করিয়ে, তাঁদে পরিক্রমা এবং গোশালা মার্জন করা উচিত।

পিতামহ ভীষ্মদেব এই ব্রত করেছিলেন বিধায় এর নাম ভীষ্মপঞ্চক ব্রত। অত্যন্ত মহিমান্বিত এই ব্রত করার ফলে যে কেউ গোলকাধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে পারেন। কোনো কোনো পুরাণে উলেখ আছে যে, বিশেষতঃ যারা আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করতে চান, তারা এই ব্রত করে ভীষ্মদেব ও তাঁর আরাধ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের করুণা ভিক্ষা করতে পারেন। ভক্তরা তাদের সুবিধামতো নিম্নোক্ত স্তরগুলোর যেকোনটি অনুসরণ করতে পারেন যাতে তাদের নিত্য ভগবৎ সেবা ও সাধনার বিঘ্ন না ঘটে:

১ম স্তর : পঞ্চগব্যের একেকটি একেক দিনে গ্রহণ করা যেতে পারে। ১ম দিন - গোময়, ২য় দিন-গোমূত্র, ৩য় দিন- দুধ, ৪র্থ দিন- দধি, ৫ম দিন- গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ, দধি ও ঘিয়ের মিশ্রণে তৈরী পঞ্চগব্য।

২য় স্তর : যদি কেউ ১ম স্তর অনুসরণ করতে না পারেন তবে ফলমূল গ্রহণ করা যেতে পারে। যেসব ফলে প্রচুর বীজ রয়েছে যেমন - পেয়ারা, ডালিম, পেঁপে, শসা প্রভৃতি বর্জন করা উচিত। আলু, কাঁচাকলা বা মিষ্টিআলু সেদ্ধ করে গ্রহণ করা যেতে পারে। স্বাদের জন্য সৈন্ধব লবণ ব্যবহার অনুমোদিত। কাজুবাদাম, কিসমিস ও খেজুর গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে দুধ বা দুগ্ধজাত কোন দ্রব্য গ্রহণ করা যাবে না। নারকেল ও নারকেলের জল গ্রহণ করা যাবে।

৩য় স্তর : যদি কেউ ২য় স্তর পালনে অসমর্থ হন তবে হবিষ্যান্ন গ্রহন করতে পারেন।

এতদিন গঙ্গার মত পবিত্র নদীতে স্নান করা উচিত। নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে দিনে তিনবার ভীষ্মদেবের উদ্দেশে তর্পণ করা উচিত।

তর্পণ- ওঁ বৈয়াগ্রপাদ্য গোত্রায় সংস্কৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদ্যামেতৎ সলিলম্ ভীষ্মবর্মনে ॥

অর্ঘ- বসুনামাবতারায় শান্তনোরাত্মজায় চ।
অর্ঘ দদামি ভীষ্মায় আজন্ম ব্রহ্মচারিণে ॥

প্রণাম- ওঁ ভীষ্ম সনাতনেভ্য বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভীরাদ্ভির্বাপ্নতু পুত্রপৌত্রচিতম্ ক্রিয়াম্ ॥

ভক্তরা নিম্নের ফুলগুলো বিগ্রহকে নিবেদন করতে পারেন–

১ম দিন- শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণে অবশ্যই পদ্মফুল,
২য় দিন- শ্রীবিগ্রহের উরুতে বিল্বপত্র,
৩য় দিন- শ্রীবিগ্রহের নাভিদেশে গন্ধদ্রব্য,
৪র্থ দিন- শ্রীবিগ্রহের স্কন্ধদেশে জবাফুল ও বিল্বপত্র এবং
৫ম দিন- শ্রীবিগ্রহের মস্তকে মালতী ফুল নিবেদন করা উচিত।

যদি কখনো দু'টি তিথি একত্রে পড়ে তবে ঐদিন দুইদিনের উদ্দিষ্ট ফুলগুলো একই দিনে নিবেদন করতে পারেন।

উৎস : (শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের বিবৃতি অনুসারে অনুলিখিত) পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড- ২৩ অধ্যায়; স্কন্দ পুরাণ, বিষ্ণুখণ্ড-কার্তিক মাহাত্ম্য- ৩২ অধ্যায়; গরুড় পুরাণ, পূর্বখন্ড- ১২৩ অধ্যায়।

সমাপ্ত

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতার সারতত্ত্ব কোর্স

বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোর্স!

বিজ্ঞান কি আদৌ বিজ্ঞান সম্মত?

বিজ্ঞানের যুগে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কি?

সৃষ্টিকর্তা যদি এক হয় তবে বিশ্বে এত ধর্মমত কেন?

সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে বিভিন্ন অবতারগণ ও দেবদেবীগণের সম্পর্কই বা কি?

আত্মা ও পুনর্জন্মের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ কি?

এই বিশ্ব সৃষ্টির রহস্যই বা কি?

আপনি যদি এই কোর্সটি
করতে আগ্রহী হন
তাহলে আজই
এ্যাডমিশন
ফরম পুরণ করে
কোর্সে
ভর্তি হউন।

তথ্য সূত্রঃ-

১. সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মমত, বৈজ্ঞানিকদের কমপক্ষে দুই হাজার গ্রন্থের নির্যাস আলোচিত হবে।

২. আধুনিক বিজ্ঞান ধর্মশাস্ত্র এবং দর্শনের ভিত্তিতে আপনার এ সকল প্রশ্নের উত্তরসহ প্রাসঙ্গিক যে কোন প্রশ্নোত্তর জানতে হলে আজই ভর্তি হউন ছয়টি পর্বের শ্রীমদ্ভবদগীতা সারতত্ত্ব কোর্সে-

ভক্তিবেদান্ত গীতা একাডেমী

৭৯, স্বামীবাগ রোড, স্বামীবাগ আশ্রম, ঢাকা- ১১০০

ভক্তিবেদান্ত গীতা একাডেমী

আমাদের কার্যক্রম সমূহ ঃ

- শ্রীমদ্ভাগবত কোর্স
- ভগবদ্গীতার সারতত্ত্ব কোর্স
- ডাকযোগে গীতা স্টাডি কোর্স
- গীতা স্টাডি কোর্স, গ্রেড-১
- গীতা স্টাডি কোর্স, গ্রেড-২
- মাসিক গীতা সেমিনার
- পারমার্থিক শিক্ষা সফর

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান এবং ধর্ম বিষয়ে এই কোর্স গুলো আপনার জ্ঞানের পরিধিকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

স্বামীবাগ আশ্রম, ৭৯ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা- ১১০০

ফোন (অফিস) : ০২- ৯৫১১৭৮১, মোবাইল : ০১৯১৬-৮২৩৬৯৭

দুর্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে।